ভগবৎ-দর্শন

৪১ বর্ষ ▪ ৩য় সংখ্যা ▪ ত্রিবিক্রম ৫৩১ ▪ মে ২০১৭

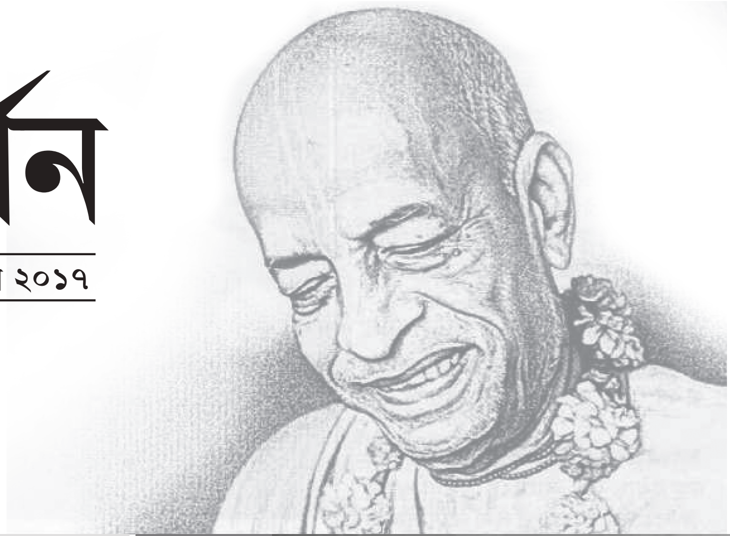

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ

টাকা পাপ কার্যের প্রতি উৎসাহিত করে	৪
বৈষ্ণবেরাই মানব সমাজের সব থেকে বড় হিতকারী	৭
প্রহ্লাদ-নৃসিংহ কথা	৯
অশ্রুতকে শুনুন	১১
আমরা কি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উপার্জন করি	১৬
ভক্তসত্য রক্ষার্থে শ্রীনৃসিংহদেব	২৩
পাপ ও অপরাধ	২৯

বিভাগ

প্রশ্ন উত্তর	৩
ভক্তি কবিতা	১৪
ছোটদের আসর	১৯
ভক্তের ভগবান (ভক্তরক্ষক নরসিংহদেব)	২০
অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	২৮
ইসকন সমাচার	৩১

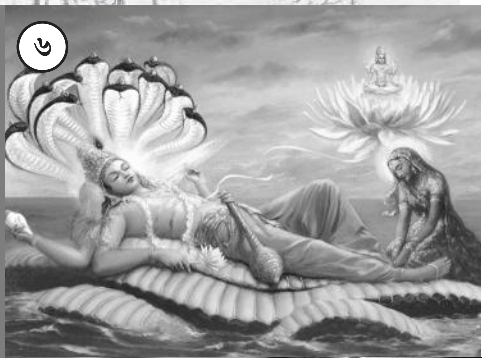

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে)
আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **প্রুফ সংশোধক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রবন্ধক** এম সিং ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** সুশান্ত কুমার রায় ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **শ্রী অমল পুরাণ দাস ব্রহ্মচারী** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, ফোনঃ (০৩৩) ২২৮৯-৬২৪৭,২২৮৯-৬৪৪৬, মোবাইলঃ ৮৬২১০০৭৮১৩,

মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ভগবৎ দর্শন **(বুক পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ১০০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৪৫০ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৯০০ টাকা ● সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ২২৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ১৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৬৭৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ১৩০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিস্ট্রি পোস্ট)** ১ বছরের জন্য (১ মাস অন্তর)- ২৮০ টাকা, ১ বছরের জন্য (প্রতি মাসে) - ৪২০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(কুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য ভগবৎ দর্শন - ২৫০ টাকা, ১ বছরের জন্য সংকীর্তন সমাচার - ২০০ টাকা, ১ বছরের জন্য দুটি - ৩০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গ্রাহক ভিক্ষা - ৪৯০ টাকা ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান।**

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা পাঠক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক পাঠক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৭ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

আসুন, আমরা সহযোগিতা করি

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, 'তোমরা একে অপরকে কিভাবে সহযোগিতা করো তার উপরই আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা পরিস্ফুটিত হবে।'

সহযোগিতার অর্থ হল যে, কোন মতভেদের বিনিময়েও ঐকান্তিকভাবে কাজ করার ইচ্ছা। আমরা সর্বদাই সেই সমস্ত লোকেদের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করি যারা আমার মতো চিন্তা করবে, আমার মতো আচরণ করবে, আমার মতো কথা বলবে এবং আমাদের সাহায্য করবে, আমাদের বুঝবে, সর্বোপরি আমাদের প্রশংসা করবে। এইরূপ এই জড় জগতে একই মানসিকতা সম্পন্ন লোক খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার সমান। আমরা জন্মাবধি একে অপরের থেকে আলাদা, আমরা আলাদা আলাদা গুণ সম্পন্ন, এমনকি আমরা দেখতেও আলাদা। আমরা সকলেই যদি একই রকম হতাম তাহলে জীবনটা খুবই একঘেয়ে হতো। আমাদের মৌলিক ব্যক্তিত্বই আমাদের শক্তি। আমাদের মৌলিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের জীবন ধারণ করতে হবে এবং একই সঙ্গে অন্যদের অনন্য গুণগুলিরও প্রশংসা করতে হবে। এইভাবেই জীবন বর্ণময় হয়ে উঠবে।

পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদের এই শিক্ষা প্রদানের জন্য যে, কিভাবে অপরের সঙ্গে বসবাস করা যায়। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন বিস্ময়কর প্রাপ্তি তখনই ঘটে যখন আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ করি এবং একে অপরের প্রতিদানের প্রশংসা করি।

শ্রীল প্রভুপাদ চাইতেন, আমরা যেন কোন দুরভিসন্ধি না নিয়ে নিষ্কামভাবে সেবা করি। যখন আমরা সবাই এক সঙ্গে মিলি তখন সেখানে মতান্তর হতেই পারে, কিন্তু বৃহৎ কারণের জন্য সর্বোপরি আমাদের মুক্তির জন্য আমাদের অবশ্যই ব্যতিক্রমের সঙ্গে বাস করা শিখতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সৈন্যরা আক্রান্ত হয় তখন নিজেদের বাঁচাবার জন্য এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য তাদের একত্রে যুদ্ধ করতে হয়। কল্পনা করুন যে, শত্রুরা এগিয়ে আসছে এবং সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করেছে। এই রকম পরিস্থিতি তাদেরকে নিশ্চিত পরাজয় এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে।

এই পৃথিবীতে আমরা নিরন্তর মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের সৈন্যদের সর্বদা একত্রে দাঁড়াতে হবে। এটি আমাদের মায়ার কবল থেকে রক্ষা করবে। আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হল কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করা এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার আন্দোলনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। এই আন্দোলনকে সফল করতে আমাদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের সর্বদাই একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখতে হবে।

এতে শ্রীল প্রভুপাদ সন্তুষ্ট হবেন এবং যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তবেই আমাদের জীবন সফল হবে।

প্রশ্ন ১। জগতে যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। তাহলে এখনও ধর্মের গ্লানি হচ্ছে, অধর্মের ছড়াছড়ি, তবে কেন এখন ভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন না?

—পুতুল রায়, আরামবাগ, হুগলী

উত্তর ঃ শ্রীভগবানের উক্তি এই যে, 'যে সময়ে হিংসাপরায়ণ অত্যাচারী ব্যক্তিরা এই জগৎকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, যে ব্যক্তিদেরকে বধ করতে দেবতারাও সক্ষম হয় না, এমন সব প্রভাবশালী অধর্মাচারীদের প্রাদুর্ভাব হলে, আমি সেই সময়ে মানুষদেহ ধারণ করে শুভকর্মাদের ঘরে আবির্ভূত হয়ে উৎপাতকারীদেরকে সংহার করে থাকি।' (মহাভারত, বনপর্ব ১৮৯ অধ্যায়)

কিন্তু, এখন যে সব অধর্মপরায়ণ ক্ষণজন্মা ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মেছে, তাদেরকে বধ করতে কোনও দেবতাকেই দরকার পড়বে না, আর স্বয়ং ভগবানের আসা তো অনেক দূরের কথা। কেননা, অল্প আয়ু এবং আধিব্যাধি উপদ্রুত ব্যক্তিরা সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, কিংবা যে কেউই তাদেরকে মেরে ফেলছে। অতএব তাদেরকে নাশ করতে ভগবানের অবতরণের অপেক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ২। একজন মানুষকে সাধু বলে বোঝা যাবে তার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে?

—সুজন মল্লিক, পশ্চিম মেদিনীপুর

উত্তর ঃ সাধু ব্যক্তির দুটি লক্ষণ আছে। তটস্থ লক্ষণ এবং স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণগুলো হলো — ১) তিতিক্ষু (সহিষ্ণু) ঃ হরিকীর্তনের জন্য, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য সমস্ত প্রতিকূলতাকে তিনি সহ্য করে থাকেন।

২) কারুণিক (দয়ালু) ঃ তিনি জীবের দুঃখ দেখে তার প্রতি কৃপা করে থাকেন। তিনি কেবল নিজের মুক্তিতে সন্তুষ্ট নন, তিনি সর্বদা অন্যের শুভগতির কথা চিন্তা করেন। অধঃপতিত জীবেদের প্রতি তিনি কৃপালু।

৩) সুহৃদ (বন্ধুত্বপূর্ণ) ঃ তিনি সমস্ত জীবদের প্রতি এমনভাবে আচরণ করেন, যাতে তারা চরমে জড়জগতের দুঃখময় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মানুষ এই জগতে কিভাবে থাকবে এবং কিভাবে চিন্ময় জীবনে উপনীত হবে সেই পদ্ধতি তিনি শিখাতে থাকেন।

৪) অজাত শত্রু (কারও প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নন) ঃ সাধু কারও প্রতি শত্রু ভাব পোষণ করেন না, যদিও বা অকৃতজ্ঞ মানুষ সাধুর প্রতি শত্রুতা করে।

৫) শান্ত (সংযত চিত্ত) ঃ তিনি কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা শূন্য হয়ে জীবন যাপন করেন।

৬) সাধব (শাস্ত্র অনুসরণকারী) ঃ তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন।

স্বরূপ লক্ষণগুলি হলো — ১) ভগবৎ সেবা নিষ্ঠ ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভজনীয় বিষয় জ্ঞানে তিনি একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করেন।

৭) শ্রবণকীর্তন নিষ্ঠ ঃ নিরন্তর তিনি শ্রীহরির কথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করেন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

আপনার ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময় করুন।
আপনার জীবনের মহত্বপূর্ণ দর্শনচিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভুতি সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
আপনার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠি আমাদের ই-মেল করুন

ভগবৎ-দর্শনের জন্য লিখুন

btgbengali@gmail.com

প্রাতঃ ভ্রমণ ডিসেম্বর ৩১, ১৯৭৩ লস এঞ্জেলেস্

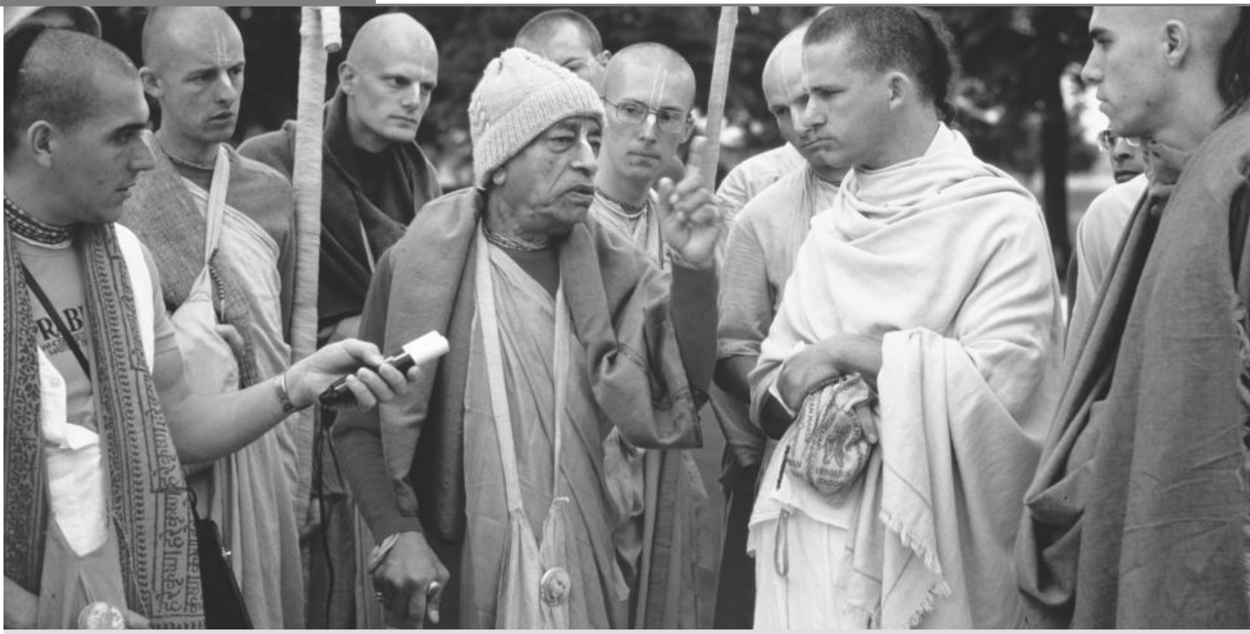

টাকা পাপ কার্যের প্রতি উৎসাহিত করে

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

টাকার স্বর্ণমূল্য মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ সঞ্চিত সোনা অনুযায়ী টাকার মূল্য থাকে না। মূল নীতিই হল মিথ্যা, কারণ প্রকৃতপক্ষে সঞ্চিত স্বর্ণের থেকে অনেক বেশী মূল্যের টাকা বাজারে ছাড়া হয়। টাকার এই কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি যা কর্তৃপক্ষ তৈরী করে তা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ভ্রষ্টাচারকে উৎসাহিত করে। কালো টাকার জন্য ভোগ্যপণ্যের কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। কালো টাকা সাদা টাকাকে বিনাশ করে। কাগজের টাকার পরিবর্তে প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত এবং সেটাই স্বর্ণের ভ্রষ্টাচারকে রোধ করবে। মহিলাদের স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে পরিমাণগতভাবে, গুণগতভাবে নয়। এইভাবে এটি লোভ, ঈর্ষা এবং বিবাদকে অনুৎসাহিত করবে। যখন প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার হবে তখন মিথ্যা ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি সোনার প্রভাবে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে ভ্রষ্টাচার বিরোধী মন্ত্রালয়ের কোন প্রয়োজন থাকবে না যা পরোক্ষভাবে মিথ্যা এবং ভ্রষ্টাচারের অপর নাম।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। অপরাধ মূলক কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ, পৃথিবীতে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তারা অপরাধমূলক কর্মকে ক্রয় করতে পারে, যে কার্যগুলি মুদ্রাস্ফীতির ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার কাছে কালো টাকা আছে, তা দিয়ে আমি অবৈধ যৌন সম্পর্ক, মদ, নেশা ইত্যাদি কিনতে পারি এবং ...... আজকাল ব্যাঙ্ক একটা কার্ড দিচ্ছে, 'অ্যামেরি কার্ড' এটা কি?

করন্ধর ঃ চার্জ কার্ড — ব্যাঙ্ক অ্যামেরি কার্ড।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং আপনি কার্ড দেখিয়ে জিনিস পেতে পারেন।

অতএব বিনিময় হিসাবে এটি খুব সস্তা হয়ে গেছে। অতএব খুব সস্তায় আপনি জিনিস ক্রয় করতে পারেন। সুতরাং খুব সস্তায় আপনি অপরাধ মূলক জিনিসও ক্রয় করতে পারেন। মানুষ আরও বেশী করে পাপী হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক অর্থনীতি বলছে, 'মানুষকে কঠোর পরিশ্রমে ব্যস্ত রাখ যাতে অধিক উৎপাদন হয় এবং কৃত্রিমভাবে প্রতারিত করে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য অর্জন কর।' এই হলো আধুনিক অর্থনীতি। সুতরাং একজন শ্রমিক প্রতিমাসে তিন হাজার ডলার পাচ্ছে, কিন্তু সে কাগজ পাচ্ছে। সে ভাবছে, আমি টাকা পাচ্ছি। সে তার শ্রম দিচ্ছে এবং উৎপাদন হচ্ছে। এই হলো নীতি। প্রতারিত কর, টাকা না দিয়ে তাকে কাগজ দাও এবং উৎপাদনের জন্য তার শ্রম নাও। এই হলো আধুনিক অর্থনীতি। এই নয় কি? একজন শ্রমিক, একজন কর্মী উচ্চ বেতন পাচ্ছে। সুতরাং সে কি পাচ্ছে। কাগজ, সে তার শ্রম দিতে খুবই উৎসাহী। সুতরাং উৎপাদন বেশী, যখন আপনি জিনিস কিনতে যাবেন তখন আবার আপনাকে মূল্য দিতে হবে। যা আপনি রোজগার করেছেন সমস্তই আপনাকে দিতে হবে, হয় ব্যাঙ্কে না হয় মানুষকে। প্রতারণার প্রক্রিয়া চলছে। এর কোন সমাধান নেই। লোক প্রতারক হয়ে গেছে। তাদের শেখানো হচ্ছে কেমনভাবে প্রতারণা করতে হয়। প্রত্যেকের মধ্যেই প্রতারণামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি হলো জড় জাগতিক বদ্ধ জীবন। চারটি ত্রুটি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপটব। সুতরাং প্রত্যেকের মধ্যেই প্রতারণা করার মনোভাব রয়েছে। সেই মনোভাবকে আরও অধিকভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এটি কমানোর অথবা বন্ধ করার পরিবর্তে আরও বেশী করে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বহুলাশ্ব ঃ সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃতে যা আসলে এর কোন সমাধান নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, 'হরৌ অভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা' মানব সমাজে কোন সুগুণ থাকতেই পারে না যতক্ষণ না তারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করছে। হ্যাঁ, ভগবৎ চেতনা, তাহলেই সবাই সৎ হবে এবং সবকিছু সঠিক ভাবে চলবে।

যদিও পৃথিবীতে টাকার কোন অভাব নেই কিন্তু শান্তির অভাব রয়েছে। অধিক মানব শক্তিকে টাকা উপার্জনের জন্য কাজে লাগানো হয়েছে। সাধারণ জনশক্তির আরও আরও ডলার উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সুদূর প্রসারী পথ হলো এই যে, এই অনিয়ন্ত্রিত এবং অনৈতিক মুদ্রাস্ফীতি সারা পৃথিবীতে একটি কালো অর্থনীতি তৈরী করেছে এবং এটি আমাদের প্রচুর মূল্যবান অস্ত্র তৈরীতে উৎসাহিত করছে যা এই সস্তা অর্থ তৈরীর ফসলকে ধ্বংস করবে। বৃহৎ অর্থ উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলির নেতারা কখনোই শান্তি ভোগ করছেন না। বরঞ্চ বিভিন্ন পরিকল্পনা করছেন কিভাবে আসন্ন পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। বস্তুতঃ প্রচুর পরিমাণে অর্থ জলের মতো অপচয় করা হচ্ছে এই সমস্ত প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরীর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলির মাধ্যমে শুধু প্রচুর পরিমাণে অর্থই অপচয় হচ্ছে না, বহু প্রাণও ধ্বংস হচ্ছে। এইভাবে সমগ্র জাতি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। যখন মানবকুল ইন্দ্রিয় সুখভোগ দ্বারা পরিচালিত হয় তখন উপার্জিত অর্থই নষ্ট হয় এবং মানব সমাজের ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃতির নিয়ম আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক অর্থ গ্রহণ করতে আজ্ঞা দেয় না। প্রকৃতির নিয়মে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে যাতে প্রত্যেক জীবাত্মা তার খাদ্য এবং বাসস্থান পায়।

এইভাবে মানব সমাজের শক্তি প্রকৃতির নিয়মে নষ্ট হচ্ছে।

কারণ ভগবান, যিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শক্তির উৎস, মানুষেরা তার বিরোধিতা করছে। ঐশ্বর্যের পূজা হয় মা লক্ষ্মীরূপে, যিনি ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং যিনি সর্বদা ভগবান নারায়ণের সেবারতা। ভগবান নারায়ণ হলেন সমস্ত নর বা সমস্ত জীবাত্মার উৎস। অতএব সমস্ত নরের ঐশ্বর্যের দেবীর আজ্ঞানুক্রমে নারায়ণের সেবা করা উচিত। জীবাত্মা কখনোই নারায়ণের সেবা ছাড়া ঐশ্বর্যের দেবীর অনুকম্পা পেতে পারে না এবং সেই জন্যই যখন তারা তাঁকে ভুল ভাবে প্রাপ্ত করতে চায়, তারা প্রকৃতির নিয়মে শাস্তি পায়। এই নিয়ম তখন নিশ্চিত করে যে, অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল।

অসদুপায়ে একত্রিত অর্থ আজকাল কৃপণ নাগরিকদের হাত থেকে রাষ্ট্র বিভিন্ন করের মাধ্যমে ছিনিয়ে নিচ্ছে যা ভবিষ্যতে জনযুদ্ধ এবং রাষ্ট্র যুদ্ধের তহবিল তৈরীতে ব্যবহৃত হবে। এটিও টাকার ধ্বংস মূলক অপচয়। নাগরিকরাও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থে সন্তুষ্ট নয় যা তাদের পরিবারকে সুচারু রূপে প্রতিপালন করতে বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে, যে দুটিই হলো মানব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখন প্রত্যেকেই অপরিসীম অর্থ উপার্জন করতে চায় তাদের অতৃপ্ত কামনা পরিতৃপ্ত করার জন্য। মানুষের এই অনৈতিক কামনা বাসনার অনুপাতে তাদের সঞ্চিত অর্থ চলে যায় মায়াশক্তির বিভিন্ন প্রতিনিধির হাতে যেমন ডাক্তার, আইনজীবি, কর আদায়কারী, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, ভন্ড ধর্মযাজক, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে। একজন কৃপণ

যিনি একটি 'ব্যাক টু গড হেড' বই কিনতে দ্বিধাবোধ করেন তিনি প্রতি সপ্তাহে দুহাজার ডলার ঔষধ কিনতে খরচ করেন এবং তারপর মারা যান। অন্য একটি লোক যিনি ভগবানের সেবায় এক পয়সা ব্যয় করতে অস্বীকার করেন তিনি মামলায় হাজার হাজার ডলার নষ্ট করেন। এই রকম বহু উদাহরণ আছে যা মায়া শক্তির প্রভাবে ঘটে চলেছে। অবশ্যই এই হলো প্রকৃতির নিয়ম। যদি অর্থ ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত না হয় তাহলে এটি শক্তির অপচয় হবে, মামলা অথবা রোগ রূপে। মূর্খ মানুষ ঐগুলি দেখতে পায় না, সেই জন্য তারা ভগবানের নিয়মে বোকা বনে।

প্রকৃতির নিয়ম আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক অর্থ গ্রহণ করতে আজ্ঞা দেয় না। প্রকৃতির নিয়মে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে যাতে প্রত্যেক জীবাত্মা তার খাদ্য এবং বাসস্থান পায়। কিন্তু মানুষের অতৃপ্ত লোভ, পরমেশ্বর ভগবানের নিয়মকে লঙ্ঘন করে। পরমেশ্বর ভগবানের নিয়মে লবনের সাগর রয়েছে, কারণ লবন জীবাত্মার জন্য প্রয়োজন। এইরূপেই ভগবান পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো এবং বাতাসের ব্যবস্থা

করেছেন যেগুলিও আমাদের প্রয়োজন। যে কেউ প্রাকৃতিক ভান্ডার থেকে লবন নিতে পারে। কিন্তু নিয়মানুযায়ী আমাদের যতটা প্রয়োজন তার বেশী লবন আমরা নিতে পারি না। যদি আমরা বেশী লবন ব্যবহার করি তাহলে আমরা রান্নাকে নষ্ট করব এবং যদি আমরা কম লবন নিই তাহলে আমাদের খাবার বিস্বাদ হয়ে যাবে। অপরপক্ষে যতটা আমাদের প্রয়োজন শুধু ততটা নিলেই আমাদের খাদ্যও সুস্বাদু হবে এবং আমরাও স্বাস্থ্যবান থাকব। বর্তমানে চতুর্দিকে এই বিষয়ে সতর্কতা দেখা দিচ্ছে যে, আমাদের প্রাকৃতিক উৎসগুলি দূষিত হয়ে যাচ্ছে এবং শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে পর্যাপ্ত যোগান রয়েছে কিন্তু অপব্যবহার এবং লোভের কারণে সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষণকারীরা এবং পরিবেশবিদেরা বুঝতে পারছেন না যে, সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে মানব সমাজের অতৃপ্ত লোভ দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করবে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিনা অস্তিত্বের কোন স্তরেই শান্তি অসম্ভব।

বৈষ্ণবেরাই মানব সমাজের সব থেকে বড় হিতকারী

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

জড়জাগতিক জীবনধারা স্বার্থপর জীবনধারা, অপরপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিঃস্বার্থ জীবনধারা। স্বার্থহীন বলতে বোঝায় যে, নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে উৎসাহী না হয়ে অপরের হিতের জন্য অধিক উদ্বিগ্ন থাকে এবং অন্যদের হিতের জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন করতে প্রস্তুত থাকেন এবং এটি একটি প্রকৃত উন্নততর ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। এই সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভগবান শিবের স্থান সর্বোত্তম। একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই ভগবান শিবের অবস্থান কি। 'বৈষ্ণবানাম্ যথা শম্ভু', সমস্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে কৃষ্ণভক্ত হিসাবে ভগবান শিবের স্থান সর্বোত্তম। তিনি একজন বৈষ্ণব এবং একজন বৈষ্ণবই প্রকৃতরূপে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হতে পারেন। 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম', একজন কৃষ্ণভক্তের কোন কামনা থাকে না, 'কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত' (চৈ. চ. মধ্য ১৯-১৪৯), তাই তিনি সম্পূর্ণ শান্ত। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি - কামী সকলই অশান্ত। যারা জড়জাগতিক সুখের অভিলাষী, যারা মুক্তিকামী, যারা যোগ সিদ্ধি অভিলাষী তারা সকলেই সংশয়াপন্ন এবং বিরক্ত। শুধুমাত্র একজন কৃষ্ণভক্তই সম্পূর্ণ শান্ত।

সুতরাং এই হলো একজন বৈষ্ণব এবং কেন বৈষ্ণবরা সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারেন? কারণ তার কোনরূপ ব্যক্তিগত কামনা নেই। তার কোন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভিলাষ নেই। তার একমাত্র অভিলাষ হলো কৃষ্ণের সেবা করা, তার একমাত্র অভিলাষ হলো কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা। তিনি তাই সকলকেই কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে দেখতে পান। তিনি সকল জীব এবং সকল বস্তুই কৃষ্ণময় দেখতে পান এবং তাই তিনি সকলের হিতের জন্য প্রকৃত উদ্বিগ্ন থাকেন। তিনি ব্যক্তিগত কামনার পরোয়া করেন না কিন্তু তিনি অন্যের হিতের জন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকেন। তিনি প্রত্যেককেই কৃষ্ণের অংশ হিসাবে দেখেন। সেইজন্য তিনি প্রত্যেকের হিতের অভিলাষী। কারণ কৃষ্ণ তাই চান এবং কৃষ্ণ সকলের মঙ্গল চান এবং যখন তিনি কৃষ্ণের সেবা করতে সচেষ্ট তার অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেকের সেবা করার জন্য প্রস্তুত। অবশ্যই পক্ষান্তরে অন্যের সেবা করার অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃষ্ণেরই সেবা করেন এবং এইরূপে প্রত্যেকেই সেবা পান এবং সন্তুষ্ট হন।

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার উদাহরণটি দিয়েছিলেন। যখন গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হয় তখন সমগ্র গাছটি জল পায়। কৃষ্ণের সেবা করে তিনি প্রত্যেকের হিত সাধন করেন। এবং একই সঙ্গে তিনি প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের অংশ হিসাবে দেখতে পান। তাই শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই বলতেন, 'কৃষ্ণকে সেবা করার সর্বোত্তম উপায় হলো তাঁর ভক্তদের সেবা করা।' তাঁরা যারা কৃষ্ণের প্রিয়, যদি তাদের সেবা করা হয় তাহলে কৃষ্ণের সেবা করা হয় এবং কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। শ্রীল প্রভুপাদ এই অভিব্যক্তি সর্বদাই ব্যক্ত করতেন, 'আমাকে ভালবাস, আমার কুকুরকেও ভালবাস।' যদি তুমি আমাকে ভালবাস তাহলে আমি যাকে ভালবাসি তুমি তাকেও ভালবাসবে। আমি আমার কুকুরকে ভালবাসি, সুতরাং সেও আমাকে ভালবাসে; তুমি আমার কুকুরকেও ভালবাসবে। এই রূপে যখন প্রভু দেখেন কেউ তার কুকুরের সঙ্গে অনুকুল ব্যবহার করছে তখন তিনি তার সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার করেন, এবং অবশ্যই এটি শুধুই একটি অভিব্যক্তির প্রকাশ। কিন্তু আসল কথা হলো পিতা তখন সন্তুষ্ট হন যখন তিনি দেখেন কেউ তার পুত্রের জন্য কিছু করছে, তার পুত্রের সেবা করছে ইত্যাদি। তাই যখন তিনি দেখেন কেউ তার প্রিয় পুত্রের প্রতি অনুকুল ব্যবহার করছেন তিনিও তার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে কৃষ্ণের প্রিয় ভক্তদের সেবা করলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন।

এবার প্রশ্ন হলো, আমরা কি শুধুই কৃষ্ণভক্তদের সেবা করব? না, যারা কৃষ্ণভক্ত নয় আমরা তাদেরও সেবা করব। কিন্তু তাদের সেবা করার পন্থাটি অন্যরকম। যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, যারা কৃষ্ণকে ভুলে গেছে, যারা কৃষ্ণ থেকে বহুদূরে সরে গেছে আমরা তাদের কৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাদের

সেবা করব। এই সেবাই একজন ভক্তের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একজন ভক্ত হিসাবে আমরা সর্বদাই চেষ্টা করি কৃষ্ণকে সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে, তাঁর ভক্তদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে এবং নিষ্পাপদের প্রতি সহমর্মী হতে। যারা কৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়েছে, যারা কৃষ্ণের থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের কৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা কর। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলছেন, এই সেবাই তাঁকে সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট করে কারণ তিনি একজন পিতা যিনি তাঁর সন্তানদের হারিয়েছেন। একজন পিতা কেমন অনুভব করেন যখন তাঁর সন্তান তাঁকে ছেড়ে চলে যায়? এটি তাঁর পক্ষে চরম হৃদয় বিদারক এবং তিনি অপেক্ষা করে থাকেন কখন তার পুত্র তার কছে ফিরে আসবে। তিনি তাঁর সন্তানকে ফিরিয়ে আনার জন্যে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করেন। এবার কেউ যদি তার পুত্রকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয় তাহলে পিতা সেই ব্যক্তির প্রতি কি মনোভাব ব্যক্ত করবে? সুতরাং যারা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার এবং প্রসার করছেন, যারা পতিত আত্মাদের কৃষ্ণের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে কৃষ্ণ তাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হন। তাই প্রচারই হলো সর্বোত্তম সেবা। যাও, জীবকুলকে তাদের বিস্মৃত কৃষ্ণ সম্বন্ধের কথা স্মরণ করাও এবং ফল স্বরূপ তাদের কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হোক।

হে কৃষ্ণ, তুমি কৃপা করে আমাকে এই জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করে আমাকে তোমার প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত কর।

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ একদা একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন, প্রভুপাদকে ভারতের একজন অত্যন্ত ধনীব্যক্তি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং এই লোকটি ভারতের সবচেয়ে ধনী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে এই লোকটি বিড়লা পরিবারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং প্রভুপাদ তাঁর গৃহে প্রকৃতপক্ষে অতিথি ছিলেন। তিনি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন আপনি সবাইকে শুধুই হরিনাম সংকীর্তন এবং নৃত্য করতে বলেন? কেন আপনি জনগণের হিতার্থে, সমাজের হিতার্থে কিছু করেন না? তিনি বলেন, কেন আপনি হাসপাতাল খোলেন না বা সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করেন না? এবং সেটা করলেই প্রকৃতপক্ষে সমাজসেবা করা হতো। এর উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, দেখুন আপনি বিড়লা পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এবার বিড়লা পরিবারের কোন পুত্র যদি পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং সে জানে না সে কে, কোথায় তার ঘর, সে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। পাগল হিসাবে তাকে কত অসুবিধাতে পড়তে হবে। সে খাবার পর্যন্ত পাবে না। খাবারের জন্য তাকে ভিক্ষা করতে হবে। লোকে তাকে অপমান করবে, অত্যাচার করবে। এবার আপনি যদি তাকে এই অবস্থায় দেখেন, আপনি কি শুধু তাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বলবেন যাও খেয়ে এস? অথবা আপনি তাকে স্মরণ করাবেন কে তার পিতা এবং তাকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন? তাকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনি তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবেন, কারণ সে ভারতবর্ষের অন্যতম ধনী ব্যক্তির পুত্র। অনুরূপভাবে সমস্ত জীবাত্মাই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের সন্তান, তারা সর্বোত্তম ধনীর সন্তান, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পিতাকে ভুলে গেছে তাই এই জগতে তারা এত কষ্ট, এত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এবার আপনি তাদের এই অবস্থায় দেখলে তাদেরকে কি শুধু পাঁচ টাকা দিয়ে বলবেন যে, যাও গিয়ে খেয়ে এস, না তাদের পিতার কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন? এই জড়জাগতিক অস্থায়ী উপকার প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান একটা কাজেই হতে পারবে। তাদের পিতার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত করা। তাই আমরা এই কাজ করছি। আমরা তাদের কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা স্মরণ করাচ্ছি।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে — প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ পুণর্জাগরণের উপায়, আমাদের কৃষ্ণ স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে, কৃষ্ণকে এবং তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই বা কি, সেটাই ঘটছে। আমরা যখন জপ করি তখন শুধুই তা জপ নয়, আমরা ভক্তসঙ্গও করি। ভক্তসঙ্গ করে আমরা সর্বদা স্মরণ করি যে, কৃষ্ণকে এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টার অভিব্যক্তিই হলো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র। একটি প্রার্থনা, 'হে কৃষ্ণ, তুমি কৃপা করে আমাকে এই জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করে আমাকে তোমার প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত কর।'

সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই শ্রীল প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাই আমরা সবাই এখানে, আমাদের একমাত্র কাজ হলো কৃষ্ণের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের কথা সবাইকে স্মরণ করানো এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করে এই জড় জগতের যে দুঃখ-কষ্টে তারা নিমজ্জিত আছে তা থেকে তাদের মুক্ত করা।

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বর্তমানে ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। উনি বিগত তিন দশক ধরে সমগ্র বিশ্বভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করেছেন এবং অগণিত মানুষকে মার্গদর্শন প্রদান করেছেন।

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
(033) 2289 6446/8621007813
btgbengali@gmail.com

প্রহ্লাদ-নৃসিংহ কথা

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

একদিন ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে জানতে চাইলেন, হে পরমারাধ্য ভগবান, হে প্রভু, আমি সবসময়ই আপনাকে স্মরণ করি। আপনার প্রতি কিভাবে আমার এরকম ভক্তি উৎপন্ন হলো। কিভাবে আমি আপনার প্রিয় ভক্ত হলাম, তার কারণ দয়া করে বলুন।

শ্রীনৃসিংহদেব বললেন, হে প্রহ্লাদ, তুমি মন দিয়ে শোনো। পূর্বকল্পে অবন্তীপুরে বসু শর্মা নামে সুবিখ্যাত এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করত। বৈদিক সমস্ত আচরণে সে নিষ্ঠাপরায়ণ ছিল। সে কোনও রকম পাপাচার করেনি। তার সুশীলা নামে সদাচার নিপুণা পতিব্রতা এক স্ত্রী ছিল। সেই ব্রাহ্মণ দম্পতির পাঁচটি পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে চার পুত্র বিদ্বান ও মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল। সদাচার সম্পন্ন ছিল।

কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রটি ছিল অসদাচারী। সে বেদ অধ্যয়ন করত না। সে নেশাভাঙ করত। বেশ্যাদের সঙ্গে মিশত। তাই পরিবারের অন্যদের কাছে সে বিবর্জিত হয়ে পড়েছিল। সে এক বান্ধবীকে পেয়েছিল। তার ঘরেই সে বসবাস করত। তাকে সঙ্গে নিয়ে একস্থানে সে বেড়াতে গেল। নিরিবিলি এক বনের মধ্যে একটি ঢিবির কাছে এসে তারা গল্প করতে লাগল। কিন্তু কথায় কথায় দুই জনের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো। একে অপরকে দোষ দিয়ে বলতে লাগল, 'আমি তোমার সঙ্গে পড়ে জীবন নষ্ট করেছি। জীবনের মূল্য মর্যাদা হারিয়েছি। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, আমি নিজেকেই ধিক্কার দিচ্ছি।' অন্যজন বলতে লাগল, 'এই সমাজে আমি হেয় ঘৃণ্য চরিত্র রূপে পরিগণিত। আমার এই জীবনকে ধিক্। আমাকে নিয়ে তোমার কোনও কাজ ছিল না। এই সমগ্র সমাজে কেউই আমাকে ভালোবাসে না, বাসবেও না। পাপাচারীদেরকে কে চায়? হে ভগবান, হে শ্রীহরি, আমাকে ক্ষমা করো।'

সেই স্থানে দুই জনা কলহ বশত মনোক্ষুন্ন হয়ে নিজ নিজ প্রতি ধিক্কার দিয়ে সারাদিন নির্জলা উপবাসী ছিল। বেলা ডুবে গেল। রাত হলো। কারও চোখে ঘুম নেই। কিন্তু অন্তর্নিহিত যাতনা অনুভব করে উষালগ্নে দুই জনাই দেহত্যাগ করল।

হে বৎস প্রহ্লাদ, সেই দিনটি ছিল বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথি। আর সেই স্থানটি ছিল আমার মন্দির। সেটি ধ্বংসাবশেষ স্তূপ বা ঢিবি আকারে প্রকাশিত ছিল। আর, সেই দেহত্যাগকারী ছেলেটি ও তার বান্ধবী অজ্ঞাতে আমার আবির্ভাব তিথি নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত করেছিল। সেই ব্রত ফলে সেই ছেলেটি আমার উত্তম ভক্ত হয়েছে, আর তার বান্ধবীটি স্বর্গে অপ্সরা জন্ম পেয়ে বহু সুখ ভোগ করে এসে আমাতে প্রবিষ্ট হয়েছে।

হে প্রহ্লাদ, সেই ছেলেটি হচ্ছে তুমি। এই বৈশাখী শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে আমার ব্রত পালন করে দেবতাগণ স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করছে। ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি লাভের উদ্দেশ্যে এই ব্রত করেছিলেন। শিব ত্রিপুরাসুরকে বধের তাগিদে আমার এই ব্রত আচরণ করেছিলেন। বহু দেবতা, ঋষিগণ, রাজাগণ এই ব্রত পালন করেছে। এই ব্রত প্রভাবে সবাই সিদ্ধি লাভ করেছে। ধূর্তা বিলাসিনী নারীর উদ্ধারের জন্যও এই ব্রত উপস্থিত হয়। এই ব্রত প্রভাবে তোমার আমাতে উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয়েছে।

হে প্রহ্লাদ, যে সমস্ত মানুষ আমার ব্রত পালন করবে, শতকোটি কল্পেও তাদের দুঃখময় সংসারে পুনরাগমন হয় না। আমার ব্রত প্রভাবে অপুত্র ব্যক্তি ভক্তপুত্র লাভ করে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তেজস্কামী তেজ এবং রাজ্যকামী উত্তম রাজ্য লাভ করে। আয়ুষ্কামী দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। স্ত্রী-পুরুষ যারা এই উত্তম ব্রত পালন করে, তাদের আমি সুখ ও ভুক্তি মুক্তি ফল দান করি।

হে প্রহ্লাদ, কলিযুগে যেমন যেমন স্থানে পাপের প্রবৃত্তি

হয়, সেই সেই স্থানে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি আমার ব্রত পালন করে। দুরাত্মাদের আমার ব্রত পালনে মতি হয় না। তাদের বেদ বিরুদ্ধ কর্মেই মতি হয়।

স্বাতী নক্ষত্র যোগে, শনিবারে আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। এই সকল যোগ যদি একত্র হয়, তবে কোটি হত্যাজনিত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রহ্লাদ বললেন, হে প্রভু, আপনার ব্রত পদ্ধতি কিরকম?

নৃসিংহদেব বললেন, হে বৎস প্রহ্লাদ, আমার আবির্ভাব ব্রত দিনে ভোরে উঠে স্নানশুচি হয়ে আমাকে স্মরণ করতে করতে ব্রত নিয়ম গ্রহণ করবে।

ব্রত অসমর্থ ব্যক্তিও যদি ভক্তি সহকারে এই পাপনাশন শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত কথা শ্রবণ করে, তবে শ্রবণ মাত্রেই তার ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় হয়।

নিয়ম মন্ত্র এই —

শ্রীনৃসিংহ মহাভীম দয়াং কুরু মমোপরি।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্বিঘ্নতাং নয়।।

'হে নৃসিংহদেব, হে মহাভীম, আমার উপর দয়া প্রকাশ করুন। আজ আমি আপনার ব্রত আচরণ করব, নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ করুন।'

ব্রতচারীরা আমার দিনে পাপাচারীদের সাথে ভাষণ করবে না, মিথ্যা আলাপ বর্জন করবে। আমার রূপ স্মরণ করবে। পবিত্র জলে স্নান করবে। হরিনাম বা বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করে স্নান করবে। পবিত্র বস্ত্র পরিধান করবে। গোবর দিয়ে মন্ডপ লেপন করে তাতে অষ্টদল পদ্ম আঁকবে। তামার ঘট সেই পদ্মের উপর বসাবে। ঘটের মধ্যে কোনও রত্ন থাকবে।

তার উপরে আতপ চালপূর্ণ একটি পাত্র রাখতে হবে। তার উপরে সোনার লক্ষ্মীসহ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্থাপন করবে। পঞ্চামৃত দিয়ে সেই প্রতিমাকে স্নান করাবে। তারপর নির্লোভ শান্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আনিয়ে শাস্ত্রানুসারে তাঁর দ্বারা পূজা করাবে।

তারপর নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি সহ রাত্রি জাগরণ করবে, পুরাণ পাঠ ও আমার কথা শ্রবণ করবে। তারপর সকালে স্নান পূর্বক আমাকে যত্ন সহ পূজা করবে। তারপর প্রার্থনা করবে—

মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ।
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ভবসাগরাৎ।।
পাতকার্নবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ।
তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখগতস্য মে।।
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন।।

'হে দেবেশ, আমার বংশে যারা জন্মেছে এবং যারা জন্মাবে তাদের দুঃসহ ভবসাগর থেকে উদ্ধার করুন। পাপসমুদ্রে মগ্ন ব্যাধিদুঃখরূপ জলরাশিতে তীব্র যাতনাপ্রাপ্ত মহাদুঃখী আমাকে হে শেষশায়ী, হে জগৎপতে, হে শ্রীনৃসিংহ, হে রমাকান্ত, হে ভক্তজনের ভয়নাশন, আপনি আমাকে কৃপা করে উদ্ধার করুন।'

প্রার্থনা জানিয়ে যথাবিধি প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে আচার্যকে, ভক্তদেরকে দক্ষিণা দিবে। তারপর আমাকে স্মরণ করতে করতে আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের সাথে প্রসাদ ভোজন করবে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে — ব্রত অসমর্থ ব্যক্তিও যদি ভক্তি সহকারে এই পাপনাশন শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত কথা শ্রবণ করে, তবে শ্রবণ মাত্রেই তার ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় হয়।

অশ্রুতকে শুনুন

অংকিতা সোনী

দীর্ঘ দিন পর কেউ একজন এগিয়ে এসেছে উপজাতিদের তাদের এলাকাতে গিয়ে সাহায্য করার জন্য।

আদিম, অজ্ঞ, জঙ্গলী মানুষ, মাংসাশী যা তোমরা আমাদের বল। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, আমরা একই আকাশের নিচে বাস করি এবং যে গাছের ফল খাই তা একই মাটিতে সমৃদ্ধ। আমরা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে চাই। আমাদের এই বাঁচানোর প্রচেষ্টা আমাদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। কিন্তু ধ্বংস যা তুমি আধুনিকতার নামে করছ তা আমাদেরকে বিনাশ করবে।

বহুদিন পূর্বে মানুষ প্রকৃতির খুব নিকটে বাস করত, প্রকৃতি তার গোপন কথা ফিসফিস করে তাদের কানে কানে বলত, নদী কলধ্বনিতে গান গাইত, পাখীরা তাদের কুজন প্রকৃতির সঙ্গে গাইত। প্রকৃতি তাদের মা ছিল, তিনি তাদের রক্ষা করতেন, পুষ্টি যোগাতেন। কিন্তু ক্রমশঃ লোভের দৈত্য তাদের অনেক কিছু হরণ করে নিয়েছে তাদের প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তে পরিণত হয়েছে। তারা শিল্পের স্বপ্ন দেখে দেখে বড় বড় বাড়ী, উচ্চগতি সম্পন্ন গাড়ী এবং অন্যান্য আধুনিক বিলাস। তারা প্রগতির স্বপ্ন দেখে যা ধ্বংসের দিকে চালিত করে। তারা প্রত্যেকটি মাছকে বিষাক্ত করে, প্রতিটি নদীকে শুষ্ক করে, প্রতিটি বৃক্ষকে ছেদন করে এবং বায়ুকে দূষিত করে। আর যারা প্রকৃতি মাতাকে রক্ষা করার প্রয়াস করে এটা জেনে যে, তিনি হচ্ছেন আমাদের অস্তিত্বের সোপান। আমরা তাদের আদিম বলি, অজ্ঞ বলি। আজ আমরা তাদের উপজাতিও বলি।

উপজাতিদের পরিচয় বিপন্ন

উপজাতিদের পরিচয় বিপন্ন — এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তাদের যে বাড়ীতে তারা বসবাস করে, তার জমি তাদের নয়। যে জঙ্গলে তারা বসবাস করে তার প্রত্যেকটি গাছ সরকারের। তাদের জায়গা দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে তার জল দূষিত এবং পানের অযোগ্য। তাদের নিজস্ব জমি থেকে উৎখাত হয়ে এবং সরকার দ্বারা অবহেলিত হয়ে তারা অনিচ্ছায় এক শহুরে জীবনের খোঁজে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিদানে তাদেরকে বিরাট অর্থমূল্য দিতে হয়েছে। অনাপা হেমোম, একজন স্থানীয় উপজাতি বললেন, আমাদের স্থানীয়

এলাকাতে ন্যূনতম সুবিধাগুলি যেমন, পানীয় জল, চাকুরী ইত্যাদি ছাড়াই চলতে হচ্ছিল, কিন্তু এগুলি বাড়তে থাকায় আমরা শহরে ভ্রমণ করেছি যাতে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাই। আজ আমাদের চাকরী আছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা শহরের ভাল স্কুলে পড়ছে, কিন্তু আমাদের এই সমস্ত বস্তু পেতে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। আমাদের পরিচয় এবং সংস্কৃতিকে হারাতে হয়েছে। আমরা শহুরে আদব কায়দায় অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করেছি কিন্তু হয়নি। সেখানে একটি স্থায়ী লড়াই চলছে আমাদের চাহিদা মেটাতে এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে। আমরা এই দুটির কোনটিকেও ত্যাগ করতে পারব না।

অন্য একজন উপজাতি মালতী বোরো তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন, 'আমরা যখন শহর অভিমুখী হয়েছিলাম তখন আমরা আমাদের সংস্কৃতি এবং পরিচয় পিছনে ফেলে এসেছিলাম যা আমাদের নিজস্ব ছিল। আমাদের সম্প্রদায় ভেঙে গেছে এবং যা আছে তা আমাদের অতীতের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে আছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সেই গোষ্ঠীর দিকে আঙ্গুল তুলে বলতে পারি যারা এখনো আমাদের পুরাতন সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে, যে দেখ পুত্র এরা তোমাদের পূর্বপুরুষ, আমরা একসময় এরকম ছিলাম, তোমাদের এরকম হওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি ...' এটি রূপকথার গল্পের মতো শোনাবে।

ঠিক যখন উপজাতিদের আশার আলো নিভতে বসেছিল, তখন ইসকন উপজাতি যত্ন প্রচেষ্টা (ITCI) সেটিকে পুনঃ প্রজ্বলিত করল। ITCI বিশ্বাস করে যে, উপজাতি গোষ্ঠী জ্ঞানের স্বর্ণখনি যেখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। উপজাতিরা সেই মানুষ যারা শান্তিতে খুব সহজ সরল ভাবে একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস করে। তাদের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, তাদের সরলতা, তাদের হৃদয় সমস্ত কলুষতা মুক্ত, যেটি একটি আদর্শ জীবন শৈলী যা সমগ্র বিশ্বকে কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে চালিত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে।

ITCI সেই যাত্রাতে সচেষ্ট হয়েছে যা বর্তমান এবং উপজাতিদের সরল গৌরবময় জীবনের শূন্যস্থান পূরণ করবে পাঁচ প্রকার যত্ন দ্বারা, যেমন পারমার্থিক, শারীরিক, স্নেহ, সামাজিক এবং শিক্ষা দ্বারা। শারীরিক, স্নেহ, সামাজিক এবং শিক্ষার সুবিধাগুলিকে এই সমস্ত উপজাতিদের হাতের কাছে প্রদান করতে হবে যাতে তারা শহুরে জীবনের দিকে ধাবিত না হয়। এটি তাদের সম্পদ এবং অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারে। আধ্যাত্মিক যত্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে নিজেদেরকে চেনানো এবং প্রকৃত পরিচয়ের অনুভূতি প্রদান করা। আধ্যাত্মিকতা তাদেরকে শুধুমাত্র উপজাতি হিসাবেই পরিচয় দেবে না বরং তাদেরকে আরও বৃহৎ পরিচয় প্রদান করবে যখন তারা জানতে পারবে যে, মনুষ্যকুল একে অপরের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ।

সংবাদ প্রচারে উপজাতিরা মনে করে যে, তারা পুরাতন পন্থী যদিও তাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনেক উচ্চ মানের। এটি লক্ষ বৎসরের জ্ঞানের সংমিশ্রণ, জীবন যাপন, প্রকৃতিকে সম্মান করা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরম্পরা ধারায় চলে এসেছে। তাই তাদের এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝানোর জন্য তাদেরকে আমাদের এমন একটি ক্ষেত্র দিতে হবে যার থেকে সমগ্র পৃথিবী দেখতে পায় এর মহান বৈচিত্র। এই উদ্দেশ্যই মায়াপুরে বার্ষিক সম্মেলনের জন্ম দেয় যার থেকে উপজাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য জীবনে আসে।

সংবাদ প্রচারে উপজাতিরা মনে করে যে, তারা পুরাতন পন্থী যদিও তাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনেক উচ্চ মানের।

তৃতীয় বার্ষিক ITCI সম্মেলন

তৃতীয় বার্ষিক ITCI সম্মেলন মায়াপুরে (পশ্চিমবঙ্গ) ১৯-২১শে এপ্রিল ২০১৬ তে অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতিরা আসাম, ত্রিপুরা,

পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা (ভূমিজ, বোরো, ডিফু, গে, কালহো, কারবি, কিসান, মুন্ডা, হো, রাভা, রোয়াং, সান্তাল, তাঁতি, টি উপজাতি এবং ত্রিপুরী) থেকে এক ছাদের তলায় সম্মিলিত হয়েছিল। তারা একে অপরের পরিচয় এবং সংস্কৃতি আদান প্রদান করে এবং ITCI এর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানায়।

এপ্রিল-১৯ ঃ গোপূজা করা হয় এবং ভক্তরা ক্রমাগত সংকীর্তন এবং ভজন করেন। শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এবং শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রবচন দেন।

এপ্রিল-২০ ঃ উপজাতিদেরকে ধামদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভগবান চৈতন্যদেবের লীলা স্থান সমূহ দর্শন করানো হয়।

এপ্রিল-২১ ঃ তৃতীয় দিনে গঙ্গাঘাটের দিকে শোভাযাত্রা হয়। তারা ষোড়শ উপাচারে পূজা করে। গঙ্গাস্নান, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ অস্থি বিসর্জন। এখানে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে এই সমস্ত প্রথার সুফলের উপর আলোকপাত করা হয় এবং দীক্ষা ও গায়ত্রীমন্ত্রের উপযোগিতার উপর আলোচনা হয়।

সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'জয় গোবিন্দ, গঙ্গামাতা, গাভী, গায়ত্রী এবং ভগবদ্‌গীতা'। প্রকৃতি এবং গাভীপূজা উপজাতি সংস্কৃতিতে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তারা প্রকৃতিকে একে অপরের পরিপূরক মনে করত। তারা যথার্থ উদাহরণ স্থাপন করেছিল যে, কেমন ভাবে পৃথিবীমাতার বোঝা না হয়েও পৃথিবীতে বাস করা যায়, তাকে কিভাবে সম্মান করা যায় যখন তার থেকে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাচ্ছি। কিভাবে তাকে নষ্ট না করে সমৃদ্ধ করা যায়। উপজাতিদের এই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা প্রমাণ করে যে, তারা তাদের জীবন ধারণের জন্য বন এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই এই সম্মেলন ঐ শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য পালন করল এবং মানব জীবনে প্রকৃতির গুরুত্ব, তার আত্মিক তত্ত্ব, অন্যের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদিকে পুনস্থাপিত করল।

এই সম্মেলন তাদেরকে একটা ক্ষেত্র প্রদান করল যার মাধ্যমে উপজাতিরা তাদের সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পেরেছিল। লোকনৃত্য এবং লোকসংগীত তাদের একমাত্র পথ যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন এবং সুখকে তুলে ধরে। ITCI ধন্য হয়েছিল এই খুশীতে অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং এই সমৃদ্ধময় ঐতিহ্যের অংশ হতে পেরে।

এটা মনে হয় যে, এটি একটি প্রথম পদক্ষেপ যেখানে উপজাতিরা মনে করল যে, তারা আদিম প্রজাতি নয় বরং তাদেরও একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আছে। বিবেক তন্তুবায় তার অনুভব এইভাবে প্রকাশ করলেন যে, 'ITCI তাদের জীবন ধন্য করেছে। ইসকনের এই আগ্রহ তাদের কাছে বৃহৎ আশির্বাদ, আশার আলো। এখন আমাদের কাছে ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা একত্রিত হতে পারি এবং আমরা লাভবান হতে পারি, আমাদের হৃত পরিচয় পুনস্থাপন করতে পারি।'

এই সম্মেলন এটাই প্রমাণ করে ITCI এর ভক্তদের কারোর পরিশ্রম তাদের স্বপ্নকে সার্থক করেছে। তাদের হাসিমুখ, কেমন করে গর্বের সঙ্গে তারা তাদের ঐতিহ্যকে

প্রকাশ করেছে। কেমন করে তারা নিজেদেরকে কৃষ্ণভক্তিতে উজাড় করে দিয়েছে এটাই ITCI এর সব থেকে বড় সাফল্য। মুখ্য সঞ্চালক শ্রীধাম গোবিন্দ দাস, বলেন, 'সম্ভবত তারা এই সত্যেই বিশ্বাস করেছিল যে, শেষ বৃক্ষটি ছেদনের পর এবং শেষ প্রাণীটি হত্যার পর মানব সমাজ জানতে পারবে যে, তারা টাকা খেতে পারবে না।' এই উপজাতিরা আভ্যন্তরীণ সুখ, শান্তি, সন্তোষ খুঁজে পেয়েছিল তাদের ইন্দ্রিয় তুষ্টিতে নয় বরং প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির সঙ্গে থেকে।

তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে থেকে ITCI এখন উপজাতি পরিবারের অপরিহার্য অঙ্গ। সামনে অনেক পথ বাকী, কিন্তু ITCI সুকঠিনভাবে তার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অংকিতা সোনী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রামানুজন মহাবিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক হন।

জপ করুন আনন্দিতে থাকুন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায়

শ্রী শুকদেব গোস্বামী

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায়
নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব
বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র।
কর্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস
ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ
ওঁ ক্ষ্রৌম্।।

প্রণাম তোমায় হরি, প্রণাম তোমায়।
হে শ্রীনরসিংহদেব, প্রণাম তোমায়।।
সর্ব তেজের আকর, মহা তেজীয়ান্।
বজ্রনখ বজ্রদন্ত, হে শ্রীভগবান।।
মোদের আসুরী ভাব, কর্মবন্ধ ফাঁস।
নিজ গুণে করো তুমি, সমূলে বিনাশ।।
অজ্ঞানের অন্ধকার, করো বিদূরিত।
হৃদয়ে অভয় রূপে, হও আবির্ভূত।।

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী।।

সর্ব জীব কৃষ্ণভক্তি, করুক আচার।
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ ছাড়ি, জাগুক সংসার।।
বিশ্বের মঙ্গল হোক, লোক হউ সুখী।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সবে, হোক অন্তর্মুখী।।
পরস্পরের হিত চিন্তা, হৃদে শান্তি আনে।
মন রাখো কৃষ্ণপাদ-পদ্ম মধু পানে।।

ভক্তি-অনুকুলে রাখো, হে শ্রীভগবান।
সার্থক করো মোদের, ধরাতলে প্রাণ।

মাগারদারাত্মজ-বিত্ত-বন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ ভগবৎ প্রিয়েষু নঃ।
য প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ।।

আসক্তি নাই থাকুক, ভব কারাগারে।
কিবা গৃহ বিত্ত মিত্র, পুত্র পরিবারে।।
থাকুক আসক্তি মোর, তব ভক্ত জনে।
যে তোমারে ভালো বাসে, রাখো তারি সনে।।
ভকত সেবায় মতি, হউক আমার।
তুমি সদা হও মোর, আমি যে তোমার।।
প্রণাম তোমায় হরি, প্রণাম তোমায়।
হে সর্বকালের কাল, প্রণাম তোমায়।।

অনুবাদঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446, 8621007813

আমরা কি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উপার্জন করি?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

জুন ২০১৪, 'মনোবিজ্ঞান' পত্রিকাতে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে, মানুষ তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংগ্রহে বেশী আগ্রহী।

মানুষ সংগ্রহের প্রতি কিভাবে প্রলুব্ধ তা প্রমাণ করার জন্য গবেষকরা দুই দফায় পরীক্ষা করেন।

প্রথম দফা ঃ প্রতিযোগীদেরকে কম্পিউটারের সামনে হেডসেট দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য বসে মধুর সঙ্গীত বা কুৎসিত সংগীত শুনতে পছন্দ করতে বলা হয়েছিল। প্রতিযোগীরা কিছু সময় ধরে কুৎসিত সংগীত শুনলে 'চকোলেট' রোজগার করতে পারবেন। কেউ কেউ প্রত্যেক পিস চকোলেটের জন্য কম কম সময় ধরে শুনল এবং তারা অধিক উপার্জনক্ষম হলো। আর কেউ অধিক সময় ধরে শুনল এবং কম উপার্জনক্ষম হলো।

দ্বিতীয় দফা ঃ দ্বিতীয় দফাও পাঁচ মিনিটের জন্য স্থায়ী হয়েছিল। যেখানে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তাদের রোজগারের চকোলেট খেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, যদি তারা তাদের রোজগারের চকোলেট খেতে না পারে তাহলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

উভয় উপার্জনশীল দল মনে করেছিল যে, তারা গড় পাঁচ মিনিটে ৩.৭৫টি চকোলেট খেতে পারবে। যদিও তারা চকোলেট উপার্জনের সময় তাদের গ্রহণ ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় (১০.৭৪) চকোলেট উপার্জন করেছিল। এটা প্রমাণ করে যে, তারা অধিক উপার্জনের জন্য অধিক সময় ধরে কুৎসিত নোংরা শব্দও শুনতে রাজী ছিল এটা জেনেও যে তাদের অতিরিক্ত উপার্জনের চকোলেট তারা গ্রহণ করতে পারবে না। তারা ১০.৭৪টি চকোলেট রোজগার করেছিল যখন কিনা তাদের গ্রহণ ক্ষমতা ছিল ৩.৭৫ এবং বাকীগুলি তাদের থেকে ফেরত নেওয়া হলো।

বেশী রোজগেরে এবং কম রোজগেরে উভয়েরই এই মানসিকতা দিতে চালিত হয় যে, প্রয়োজনের তুলনায় কত বেশী সংগ্রহ করতে পারবে এবং জমা করতে পারবে। এই প্রাকৃত জগতে তারা চকোলেট নয়, টাকা রোজগার করে এই মানসিকতা দিয়ে।

গবেষক লেখকদের মধ্যে, খ্রীষ্টফার সি, যিনি ব্যাবহারিক বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের অধ্যাপক, যিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগে ছিলেন, তিনি এটিকে 'অর্থহীন সংগ্রহ' আখ্যা দেন।

এই পরীক্ষা এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ অধিক সংগ্রহে বেশী আগ্রহশীল, যেমন টাকা-পয়সা ইত্যাদি যা তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, 'অর্থ কখনো এক জায়গাতে স্থায়ীভাবে থাকে না। এটি এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হয়। পরিশেষে কেউই অর্থ ভোগ করতে পারে না এবং এটি যেমন ছিল তেমনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সম্পত্তি হিসাবেই থেকে যায়।' (শ্রীমদ্ভাগবত ৫.১৪.২৪)।

অধিক সংগ্রহে আগ্রহী মানুষ অসৎ পথ অবলম্বন করে

মানুষ অধিক সংগ্রহের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না। তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে, যেমন, কর ফাঁকি ইত্যাদি। অধিক ধনবান ব্যক্তিরা ভারতবর্ষে যারা অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে তারা সিংহভাগ অর্থই সুইস ব্যাঙ্কে জমা রাখে। এই ভাবেই তারা দেশের আইনকে উপেক্ষা করে এবং কর ফাঁকি দেয়। যারা সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে তারা তা প্রকাশ করে না এমন কি, তার পরিবারের কাছেও যাতে তারা ধরা না পড়ে। এই ভাবেই সেই ব্যক্তি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন কেউই সেই অর্থের মালিককে জানতে পারে না এবং সুইস সরকার অনায়াসেই সেই অর্থের গর্বিত মালিক হয়ে যায়। এটা সত্য যে, এই কারণেই সুইস কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমা করতে অনুমতি দেয়।

৮ই নভেম্বর, ২০১৬ রাত্রি ৮.১৫ মিনিটে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন যে, আজ মধ্য রাত্রি হতে ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার নোট অচল হয়ে গেল, এটি যারা অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল তাদের কাছে এক বিশাল ধাক্কা। হঠাৎই এই বিপুল সংগৃহীত অর্থরাশি নিমেষে অর্থহীন কাগজে পরিণত হলো। অনেকেই পরবর্তীকালে এই কালো টাকা সাদাতে পরিণত করতে গিয়ে ধরাও পড়ল। অনেকেই এই অর্থ আস্তাকুড়ে বা পুড়িয়ে বা নদীতে ভাসিয়ে এর থেকে মুক্ত হতে চাইল। কিন্তু যারা টাকা সদুপায়ে অর্জন করেছিল তারা হয়রানির মধ্যে পড়েছিল কিন্তু বিরক্ত হয়নি। এই হয়রানি সহ্য করতে রাজী ছিল একটা ভালো দিশার সন্ধানের জন্য।

অসদুপায়ে রোজগার মানুষকে ভয় এবং দুঃখ দেয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চিনির ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ব্যবসা চলাকালীন তিনি দেখলেন যে, লাভ করার জন্য তাঁকে অনেক মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যবসা ত্যাগ করলেন।

সম্পদ উন্নতি নয়। প্রকৃতপক্ষে এতে কোন আনন্দ নেই। সর্বদাই চকচক করে। ধনী ব্যক্তি সর্বদাই ভীত থাকেন এমন কি নিজের সন্তানের কাছেও। সর্বত্র এই হচ্ছে সম্পদের প্রকৃত রূপ।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, 'প্রতিটি নাগরিক শুধুমাত্র পর্যাপ্ত অর্থ তার পরিবারকে সুন্দর ভাবে প্রতিপালনেই এবং পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট নয়, যখন কিনা উভয়ই মানব জীবনে অপরিহার্য। বর্তমানে প্রত্যেকেই বিপুল পরিমাণ অর্থ চায় তার অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলিকে তৃপ্ত করার জন্য। মানুষের অনৈতিক লিপ্সার সমানুপাতিক হারে তাদের রাশিকৃত অর্থ মায়া শক্তির প্রতিনিধিরা নিয়ে চলে যায় কখনো চিকিৎসক রূপে, কখনো উকিল রূপে, কখনো কর সংগ্রাহক রূপে, সমাজ সংস্কারের নামে, কখনো স্বঘোষিত ধর্মগুরু রূপে, কখনো দুর্ভিক্ষে, কখনো ভুমিকম্পে এবং এরকম আরও অনেক দুর্যোগে। প্রকৃতপক্ষে এটিই প্রকৃতির আইন; যদি অর্থ ভগবানের সেবাতে না ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটি ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হবে কখনো আইন সমস্যা রূপে, কখনো ব্যাধি রূপে। মূর্খ লোকেদের এই সত্য চেনার দৃষ্টি নেই, তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আইন তাদেরকে বোকা বানায়'। (কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতি, অধ্যায়-২)

টাকা আমাদের বোকা বানায়

আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছি যেখানে আমরা মনে করি অর্থই আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা নিরসন করতে পারবে। খুব অল্পই আমরা আমাদের সংগৃহীত অর্থের প্রকৃত মূল্য অনুভব করতে পারি। আমরা সর্বাধিক সংগ্রহ করতে চাই। অর্থকেই নাম, যশ, ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির একমাত্র পথ বলে মনে করি। আমরা অর্থ সংগ্রহের দৌড়ে আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিই না, এমনকি আমাদের প্রিয় নিকট আত্মীয়দেরকেও উপেক্ষা করি, কিন্তু অর্থেরও চরম সীমা আছে। অর্থ আমাদের হৃদয়কে চির নবীন করতে পারে না, আমাদের অশান্ত মন শান্ত করতে পারে না এবং দীর্ঘস্থায়ী সুখও প্রদান করতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত (৪-২২-৩৩) বলে, 'মনুষ্য সমাজের এই শুধু মাত্র অর্থ রোজগারের চিন্তা এবং তা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই এটি প্রত্যেকের স্বার্থহানি করে। আমরা সর্বদাই চিন্তা করি যে, আজ আমার যা সম্পদ আছে আমি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও অধিক পাবো, আজ আমার যা আছে ভবিষ্যতে আরও হবে, আরও, আরও'। (ভগবদ্ গীতা ১৬-১৩)

পারমার্থিক সম্পদের জন্য কর্ম করুন

বেদে সম্পদকেই অর্থ বলা হয়। অর্থ বলতে টাকাকে বোঝায়। আবার মানেও হয়। তাই বেদে টাকাকে অর্থ পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করার ঔচিত্যকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। বেদ সর্বদাই আমাদেরকে এটা মনে করতে বলেছে যে, আমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি। আমরা এই ক্ষণস্থায়ী জগতের অঙ্গ নই। তাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য এই জড় জগতে লিপ্ত হওয়া নয়। কারণ, এই জড় জগতে আমরা যা কিছুই সংগ্রহ করি না কেন একদিন তা আমাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। যখন মৃত্যু দূতেরা আমাদের দরজাতে কড়া নাড়বে তখন আমরা তাদেরকে এই কাগজের টাকাগুলি দিয়ে ঘুষ দিতে পারবো না এবং প্রকৃতপক্ষেই এইগুলি আমাদের জন্য অর্থহীন হয়ে যাবে। যখন আমরা এই পৃথিবী ত্যাগ করবো আমরা একটি পাই পয়সাও এই পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে পারবো না।

এই জড় জগতে তাই আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ সংগ্রহের প্রতি আগ্রহী হতে হবে, কারণ আমরা যা-ই আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণ করি তা আমাদের নিত্য ভগবদ্ ব্যাঙ্কে জমা হয়, এ কখনো নষ্ট হয় না, বরং পরম নিত্য সুখের দ্বার উন্মোচন করে।

শঙ্করাচার্য তাঁর ভজ গোবিন্দম্ প্রার্থনাতে খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন ঃ 'হে মূর্খ! অর্থ সংগ্রহের পিপাসা ত্যাগ কর। পরমার্থের প্রতি মনোনিবেশ কর। বিগত কর্মের ফলের প্রতি বিশ্বাস রেখো। সম্পদ, যৌবন এবং সঙ্গের গর্ব করো না। এইগুলি প্রত্যেকটিই মুহূর্তেই বিনষ্ট হয়। তাই এই মিথ্যা মায়ার সংসার থেকে নিজেকে মুক্ত করো এবং অন্তহীন পরম সত্যকে অর্জন করো।

হে মূঢ় জীব! সম্পদের চিন্তায় এত একাত্ম কেন? এখানে কেউ পথপ্রদর্শক নেই। এই ত্রিভুবনে একমাত্র একটি বস্তুই আছে যা তোমাকে ভবসমুদ্র পার করতে পারে। দ্রুত সৎসঙ্গের তরীতে আরোহণ করো। (প্রকৃত জ্ঞান)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করা উচিত, একবিন্দু পবিত্র গঙ্গাজল পান করা উচিত, অন্ততঃ একবার মুরারীর (কৃষ্ণ) পূজা করো। তার তখন যমের (মৃত্যুর দেবতা) সাথে কোন বিতর্ক থাকবে না। রোজ ভগবদ্ গীতা পাঠ করো। হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করো, তাঁর সহস্র লীলা কীর্তন করো। পরম এর পবিত্র সঙ্গ করো। নিজের সম্পদ দীন-দরিদ্রদের বিতরণ করো।'

সম্পদ উন্নতি নয়। প্রকৃতপক্ষে এতে কোন আনন্দ নেই। সর্বদাই চকচক করে। ধনী ব্যক্তি সর্বদাই ভীত থাকেন এমনকি নিজের সন্তানের কাছেও। সর্বত্র এই হচ্ছে সম্পদের প্রকৃত রূপ।

শঙ্করাচার্য উপদেশ দিয়েছেন, 'ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ মূঢ়মতে।'

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি টেক মহিন্দ্রায় কর্মরত।

শিক্ষক মশাইয়ের জন্য

অংক করা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প থেকে উদ্ধৃত

একদা এক জমিদার তার পুত্রকে অংক শেখানোর জন্য মাসিক পনের টাকা এবং খাদ্য ও পোশাকের জন্য আরও পনের টাকার বিনিময়ে এক শিক্ষক নিযুক্ত করলেন, কারণ তার পুত্র অংকে খুব কাঁচা ছিল।

তাৎপর্য ঃ তোমরা অনেকেই মনে কর যে, তোমাদের বড়রা তোমাদের খেলার সময়ের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব লাভের জন্য কাজ করতে বলে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অন্য রকম, খেলাধুলাতে সময় নষ্ট না করে পড়াশোনাতে মন দিলে শুধুমাত্র লাভবান হওয়া যায়। তুমি যখন ভালোভাবে পড়াশোনা করবে তখন ভালো নম্বর পাবে। লোকে তোমার প্রশংসা করবে, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এবং তুমি জীবনে সুখী হবে।

ভক্ত রক্ষক নরসিংহদেব

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

ভগবানের অনন্ত অবতার আছে তার মধ্যে অন্যতম অবতার ভক্তি বিঘ্নবিনাশকারী ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের অবতার। ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনায় ভগবান নরসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন এই জগতে। প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনী থেকে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারি। এই কাহিনীটি নাস্তিক ও আস্তিকদের সংগ্রামের কাহিনী। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত হয় তাহলে সে অনেক শত্রু লাভ করবে। কেননা এই পৃথিবীটা অসুরে পূর্ণ। এমনকি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যখন এই জগতে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর নিজের মামা শত্রু হলেন আর প্রহ্লাদ মহারাজ যখন কৃষ্ণভক্ত হলেন তাঁর নিজ পিতা শত্রু হলেন। তাই যদি কেউ মনে করেন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হলে সুন্দর ভাবে হরিভজন করব, অথবা মনে করতে পারেন চাকুরী থেকে যখন অবসর প্রাপ্ত হবো তখন নিশ্চিন্তে হরিভজন করব, অনেকে আবার বলে থাকেন যদি ভগবান আমায় কোন দুঃখ না দেন বা সমস্যা না দেন তাহলে হরিভজন করব। প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনী থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি বিপদ আমাদের আসবে তার মধ্যে আমাদের হরিভজন করতে হবে। যদি মনে করবেন সম্পূর্ণ বিপদ থেকে মুক্ত হলে হরিভজন করব সেটা সম্ভব নয়। কারণ কুয়ার জল যত তুলবেন তত আপনা থেকে জমা হবে — যেহেতু এই জগৎটা হলো সমস্যার জগৎ তাই সমস্যা থাকবেই। একটা প্রবাদ বাক্য আছে, 'যদি কেউ মনে করে ভরা নদীর জল যে দিন সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে সেই দিন নদী পার হব, তার পক্ষে নদী পার হওয়া কখনই সম্ভব হবে না'। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য বিপদের মধ্যেই হরিভজন করতে হবে। তবে ভালভাবে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত — ভগবৎ ভজন করলে একটা বিশাল সম্মান পাওয়া যায়। প্রহ্লাদকে মহারাজ বলা হয় আর তার পিতা ত্রিভুবনের পরিচালক তাকে বলা হয় রাজা। রাজার থেকে কত উন্নত মহারাজ। 'মহারাজ' সম্মানের অধিকারী কারণ রাজার রাজা, যিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যদি 'মহারাজ' সম্মান পাওয়া যায় তাহলে কেন সকলে হরিভজন করে না — তার উত্তর প্রহ্লাদ মহারাজের কাছ থেকে পাই যখন তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে প্রহ্লাদ এই ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান তুই কোথা থেকে পেয়েছিস্ আমাকে বল?' তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন —

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।

হে পিতা 'মতির্ন কৃষ্ণে' তাদের মতি কৃষ্ণ ভক্তিতে হবে না; 'পরতঃ' মানে অন্যং উপদেশে বা 'স্বতো' মানে — নিজেদের চেষ্টায় বা উপলব্ধিতে অথবা 'মিথো' মানে উভয়ের চেষ্টায়ও নয়, কারণ হে পিতা 'গৃহব্রতানাম্' যাদের বুদ্ধি দেহাত্ম বুদ্ধির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তারা কখনই বুঝতে পারবে না। পুত্রের কথা শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু উগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে কিভাবে সম্ভব?' প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন, 'হে পিতা জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিতে অবগাহন না করা পর্যন্ত বিষয়াসক্ত

ব্যক্তিরা কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আসক্ত হতে পারে না।' প্রহ্লাদ মহারাজের এই কথা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি কিভাবে একজন ব্যক্তি ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারে না এবং কিভাবে আসক্ত হতে পারে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ — যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে শুধু কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার অনুরোধ কর। অতিরিক্ত জড় বিষয় ভোগের দ্বারা যদি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে তা হলে তার একটু সময় লাগবে। একটি বাস্তব ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। কয়েক বৎসর আগে ছত্রিশগড়ের রায়পুর নামক স্টেশনে যখন প্রচার করছিলাম তখন একটি ঘরে প্রবেশ করে এক টিটি কে বললাম, 'হরে কৃষ্ণ! একটি গীতা নিন— খুব ভাল, একটু দেখুন।' সঙ্গে সঙ্গে টিটি রেগে গিয়ে বললেন, 'মারবো বুটের বাড়ী এক লাথি, বেটারা এখানে টিকিট না কেটে বই বিক্রি করতে এসেছো।' বলেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ বন্ধ করে, 'জয় নৃসিংহদেব ভগবান কি জয়' বলেছি। তারপর চোখ খুলতেই অন্য একজন টিটি বললেন, 'যান সাধুবাবা, চলে যান এখান থেকে, আপনি ইসকন রায়পুর সেন্টার থেকে এসেছেন?' আমি বললাম, 'আমি ইসকন মায়াপুর হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছি। টিটি বললেন, 'আমি ইসকন সম্বন্ধে শুনেছি।'

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন 'শ্রবণম্'। একজন টিটি ইসকন সম্বন্ধে শোনেনি, একজন টিটি ইসকন সম্বন্ধে শুনেছেন। শ্রবণের ফলে কত পরিবর্তন।

তাই যদি আমরা আত্মতত্ত্ব ব্যক্তির কাছ হতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি তাহলে সহজেই আমাদের হৃদয় পরিবর্তন হবে।

এখন আমরা নরসিংহদেবের বিভিন্ন রূপের কথা শ্রবণ করবো যা ওখানকার পুজারীবৃন্দগণ বলেছিলেন —

১) জ্বালা নৃসিংহদেব — এই রূপটি ধারণ করা মাত্রই তাঁর কেশরের স্পর্শে বহু অসুর সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল। তাঁর কেশরের স্পর্শে সব কিছু জ্বলে যাচ্ছিল। চোখদুটি স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল। যেহেতু সব কিছুকে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল তাই জ্বালা নরসিংহদেব বলা হয়। এই বিগ্রহের নাম যদি কেউ স্মরণ করে তা হলে মঙ্গল গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

২) অহোবিলা নৃসিংহ — অহো মানে আশ্চর্য এবং বিলা মানে গুহা। এমনি গুহার মধ্যে প্রহ্লাদ মহারাজ ও গরুড়দেব তপস্যা করেছিলেন। ভগবান সেই গুহার

ভেতরে প্রবেশ করে — যে রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন সেই রূপ প্রকট করেছিলেন। তাই 'অহোবিলা নৃসিংহ' বলা হয়। কারণ এত বিশাল রূপ, যে রূপটি আকাশ স্পর্শ করেছিল, সেই রূপ এই গুহার মধ্যে প্রকট করেছিলেন, তাই অহোবিলা নৃসিংহ বলা হয়। এই নৃসিংহদেবের নাম স্মরণ করলে বৃহস্পতি গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

৩) মালোলা নৃসিংহদেব — মা মানে লক্ষ্মীদেবী এবং লোলা মানে প্রিয়া। প্রহ্লাদ মহারাজকে কৃপা করার পর নৃসিংহদেব লক্ষ্মীদেবীকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। তাই অন্ধ্রপ্রদেশের ভাষায় এই নৃসিংহদেবের রূপকে 'মালোলা' বলে। এই নৃসিংহদেবের নাম স্মরণ করলে শুক্র গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

৪) বরাহ নৃসিংহদেব — এই রূপ ধারণ করে দাঁতের উপর ধরণীদেবীকে ধারণ করে আছেন। এই নৃসিংহদেবের নাম স্মরণ করলে রাহু গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

৫) করঞ্জ নৃসিংহ — এই নৃসিংহদেব করঞ্জ বৃক্ষের নীচে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই করঞ্জ নৃসিংহদেব বলা হয়। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের তপস্যায় এই নরসিংহদেব

ধনুক নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই কেউ কেউ রাঘব নৃসিংহ বলে থাকেন। এই নৃসিংহদেবের নাম স্মরণ করলে চন্দ্র গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

৬) ভার্গব নৃসিংহদেব — ভগবান পরশুরাম এখানে তপস্যা করেছিলেন। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে যে রূপে দর্শন দিয়েছিলেন সেই রূপকে ভার্গব নৃসিংহ বলা হয়। এই নৃসিংহদেবের নাম স্মরণ করলে রবিগ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

৭) যোগানন্দ নৃসিংহদেব --- এই নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে রাজনীতি এবং যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রকট হয়েছিলেন। এই বিগ্রহ খুবই শান্ত, হাস্য মুখমন্ডল এবং খুবই কৃপালু। এই নরসিংহদেবের নাম স্মরণ করলে শনি গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

৮) ছত্রবটা নৃসিংহদেব — এই নৃসিংহদেব একদিন পিপল গাছের তলায় বসেছিলেন, আর সেই সময় হাহা এবং হুহু গন্ধর্ব গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিলেন। ঐ সময় তিনি ডেকে বললেন, রোজ আমাকে গান শুনিয়ে যাবে। তাই এই বিগ্রহের উপরের দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র, নিচের ডান হাতে অভয় দান করছেন এবং বাম হাত দিয়ে গানের তাল দিচ্ছেন। এই বিগ্রহের নাম স্মরণ করলে কেতু গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

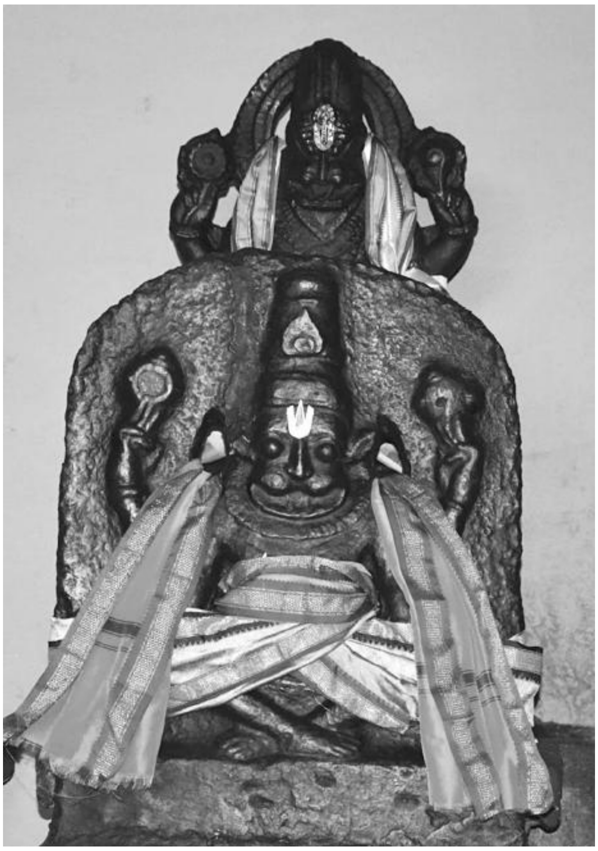

৯) পাবন নৃসিংহ — এই নৃসিংহদেবকে স্থানীয় লোকেরা জামাই বলে সম্বোধন করে থাকেন। কারণ লক্ষ্মীদেবী নীচু জাতির কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের ভাষায় চঞ্চু মানে নীচুজাতি, তাই চঞ্চু লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নৃসিংহদেব বিবাহ করে ওখানেই অবস্থান করছিলেন। যেহেতু এই বিগ্রহ সমস্ত পাপ নষ্ট করে দেন তাই পাবন নৃসিংহ বলা হয়। এই বিগ্রহের নাম উচ্চারণ করলে বা স্মরণ করলে বুধ গ্রহের দোষ নষ্ট হয়।

এইভাবে আমরা নরসিংহদেবের নাম উচ্চারণ করলে, স্তব পাঠ করলে ভক্তির বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নকে খুব সহজে অতিক্রম করতে পারি।

জয় নরসিংহদেব ভগবান কি জয়।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। এই বৎসর শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

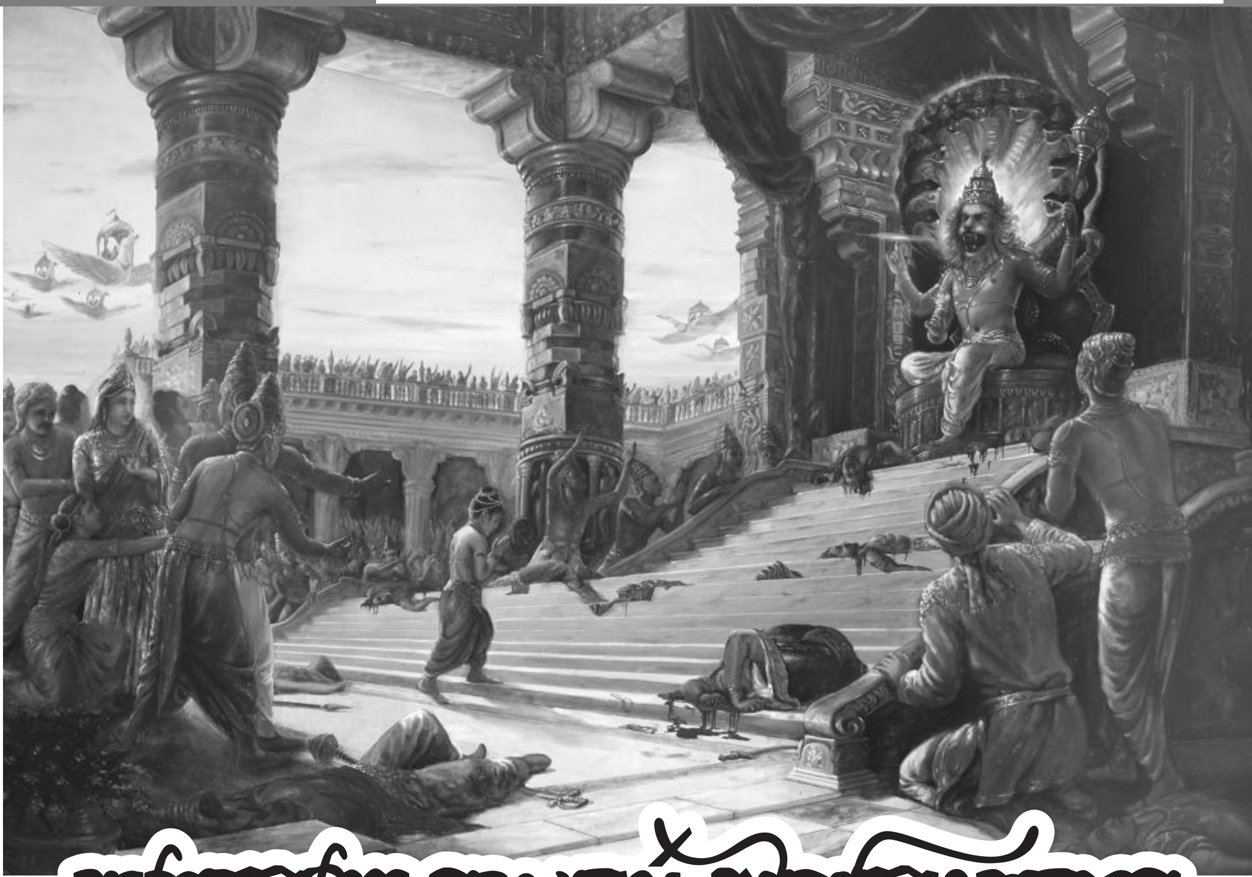

ভক্তসত্য রক্ষার্থে শ্রীনৃসিংহদেব

রাধাবিনোদিনী দাসী (বিন্তি বণিক)

মহামুনি কশ্যপ ও দিতির দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। রসাতল থেকে ধরিত্রীকে উদ্ধার করার সময় বরাহরূপী ভগবানের পথে বাধা সৃষ্টি করেন দৈত্য হিরণ্যাক্ষ। তখন হিরণ্যাক্ষকে সম্মুখ সমরে বধ করে পৃথিবীকে সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করেন বরাহদেব। ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বধ হওয়াতে, হিরণ্যকশিপু মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি অজেয়, বার্ধক্যরহিত, অমর এবং এই সংসারের একচ্ছত্র সম্রাট হবেন যাতে কেউ তাঁর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এজন্য তিনি মন্দর পর্বতের নিভৃত গুহায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে কঠিন-কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর তপস্যার তেজে নদী সমূহ ও সমুদ্র ফুঁসে উঠল, পৃথিবী ও দ্বীপসকল কেঁপে উঠল, গ্রহ-তারার পতন হতে থাকল, দশদিক তপস্যার তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তখন দেবতারা স্বর্গলোক ত্যাগ করে ব্রহ্মালোকে গমন করে ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন সেই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে। ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর সামনে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু, কোথায় হিরণ্যকশিপু! দীর্ঘকাল একভাবে তপস্যার ফলে তাঁর শরীর ঘাস, বাঁশঝাড়, উইপোকার ঢিবিতে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। পিঁপড়েরা তাঁর মেদ, ত্বক, মাংস এবং রক্ত শুষে নিয়েছিল। বর্ষার মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো তিনি আচ্ছাদিত থেকেও কঠিন তপস্যার প্রভাবে ত্রিলোককে তাপিত করছিলেন। একশত দিব্য বৎসর জল পান না করে, কেবলমাত্র দেহের অস্থিগুলোকে সম্বল করে হিরণ্যকশিপু এমন তপস্যা করেছিলেন যা ইতিপূর্বে কোন ঋষি তা করেননি আবার ভবিষ্যতেও কেউ অমন পারবে না। তাঁর তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে মনোমত বর প্রার্থনা করতে বলেন এবং তাঁর পিঁপড়ে ভক্ষিত শরীরে নিজের কমুন্ডল থেকে অমোঘ প্রভাবশালী জল ছিটিয়ে তাঁকে সর্ববয়ব সম্পন্ন, বজ্রসুকঠিন, নবীন কাঞ্চনবর্ণ যুবকের রূপ দিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রণাম নিবেদন করে বর চাইলেন — ‘প্রভু, আপনি আমায় এমন

বর প্রদান করুন যাতে আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী — মানুষ অথবা পশু, প্রাণী অথবা অপ্রাণী, দেবতা অথবা দৈত্য কিংবা নাগাদি — কেউ আমায় মৃত্যু প্রদান করতে না পারে। ভিতরে, বাইরে, দিনে, রাত্রিতে, অস্ত্র অথবা শস্ত্রের দ্বারা, পৃথিবী অথবা আকাশে, কোথাও যেন আমার মৃত্যু না ঘটে। যুদ্ধে কেউ যেন আমার সামনে দাঁড়াতে না পারে। আমিই যেন সমগ্র প্রাণীকুলের একছত্র সম্রাট হই।' ব্রহ্মা হেসে বললেন— 'এতো বড় দুর্লভ বর প্রার্থনা করলে বৎস। তবে চেয়েছো যখন, তখন তাই হবে।' অচিরেই সেই মহাদৈত্য সকল দিকসমূহ, ত্রিলোক তথা সর্বদেবতা, অসুর, নরপতি, গন্ধর্ব, সর্প, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিশাচ, প্রেত ও ভূতলোকের অধিপতি এবং সমস্ত জীবকুলের রাজাদের পরাজিত করে নিজের অধীন করলেন। তারপর স্বর্গভূমিতে বিশ্বকর্মা নির্মিত ইন্দ্রের প্রাসাদ করায়ত্ত করে সেখানে বাস করে আধিপত্য শুরু করলেন। তার কঠোর শাসনে লোকপালগণসহ সকল লোক ভীত ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। চারিদিকে সকলের ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ যেন ধ্বনিত হল।

হিরণ্যকশিপুর চার পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব কনিষ্ঠ ও গুণাবত্তায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করলেও আসুরিক প্রবৃত্তির লেশমাত্র ছিল না তাঁর ভিতর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর জন্মগত স্বাভাবিক ভালোবাসা ছিল। বাল্যকাল থেকেই খেলাধূলা পরিত্যাগ করে ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন তিনি। প্রায়ই ভগবানের জন্য প্রেমাবেশে ক্রন্দন করতেন তিনি। ভগবান তাঁর সঙ্গেই আছেন একথা ভেবে পুলকিত হয়ে হো হো করে হাসতেন মাঝে মধ্যেই। ভক্তিভরে কখনো ভগবানের জন্য গান গাইতেন। কখনো ভগবানকে সুখ দিতে নৃত্য করতেন। ভগবানের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হতেন। তাঁর লীলা স্মরণ করে আনন্দ সাগরে ভাসতেন। প্রেমাশ্রু সমেত ভগবানের পাদপঙ্কজে চিত্ত নিবিষ্ট করে শান্তিতে ভরে থাকতেন। কিন্তু তাঁর পিতা দৈত্য হিরণ্যকশিপুর নিজ পুত্রের ভগবানের প্রতি এমন ভালোবাসার ভাব, ভক্তির ভাব সহ্য হত না। প্রহ্লাদকে অপরাধী মনে করতেন, দোষী মনে করতেন অকারণে। শত্রু মনে হত তাঁকে। এমন ভ্রষ্টবুদ্ধি যাতে লোপ হয় এজন্য তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্র — ষন্ড ও অমর্ককে নিযুক্ত করলেন প্রহ্লাদের আচার্য রূপে। তাঁরা দৈত্যবালকদের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। পুত্রের মন পরীক্ষার জন্য একদিন তিনি প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে জানতে চাইলেন — 'বাবা, তোমার কী বিষয়ে আলোচনা করতে সব থেকে ভালো লাগে?' শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বললেন, 'আমি-আমার, ভেদবুদ্ধি থেকেই মানুষের যত উৎকণ্ঠা। তাই এই ভেদবুদ্ধি দূর করতে সকলের উচিত শ্রীহরির চরণে আত্মনিবেদন করা। এতেই সার্বিক কল্যান। তাই ভগবান শ্রীহরিকে নিয়ে আলোচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ।' শত্রুপক্ষের জন্য নিজপুত্রের এমন শ্রদ্ধা দেখে চিন্তান্বিত হলেন আসুরিক বুদ্ধিসম্পন্ন দৈত্য হিরণ্যকশিপু। তিনি ভাবলেন, নিশ্চিত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা ছদ্মবেশে এসে প্রহ্লাদকে ভুল পথে চালিত করছে। আচার্যদের সাবধান করে দিলেন। দৈত্যকুলের চন্দন বনে প্রহ্লাদ যেন কাঁটাযুক্ত বাবলা গাছ — এসব বলে অনেক ভৎর্সনা, তিরস্কার করলেন আচার্যরা প্রহ্লাদকে। তারপর ধর্ম, অর্থ, কাম নিয়ে নানা শিক্ষা দিলেন দীর্ঘদিন ধরে। যখন বুঝলেন যে সাম, দান, ভেদ, দন্ড বিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা হয়েছে প্রহ্লাদের, তখন তাঁরা তাঁকে তাঁর মা কয়াধু-র কাছে নিয়ে গেলেন। মা পুত্রকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্র-আভরণে সজ্জিত করে পতিদেব হিরণ্যকশিপুর কাছে নিয়ে গেলেন। আত্মজকে কোলে বসিয়ে, স্নেহাশ্রুতে ভিজিয়ে পিতা বললেন, 'বাবা, তুমি এতদিন যা যা শিখেছো তার থেকে কোন উত্তম শিক্ষা আমায় শোনাও।' ভক্ত প্রহ্লাদ বললেন, 'শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, তাঁর চরণসেবা, পূজার্চনা করা, বন্দনা করা, তাঁর প্রতি দাস্যভাব, সখ্যভাব আর আত্মনিবেদন —

এই নয় প্রকার ভক্তির অনুশীলন শিক্ষা করাকেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে মনে করি।' ব্যস্, একথা শ্রবণ করেই ক্রুর স্বভাবের হিরণ্যকশিপু ক্রোধে ফেটে পড়লেন। ভীত আচার্যেরা বললেন, 'দৈত্যরাজ, বিশ্বাস করুন, আমরা এ শিক্ষা দিইনি। এ বুদ্ধি প্রহ্লাদের জন্মগত, স্বাভাবিক।' হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করলেন পুত্রকে, 'তুমি কোথা থেকে এ শিক্ষা পেলে? আর কী শিখেছো?' প্রহ্লাদ বললেন, 'কোন বিষয়াসক্ত পুরুষের এ শিক্ষা থাকে না। তাই আপনার মত কারোর থেকে এ জ্ঞান আমার লব্ধ হয়নি। আমি আরো জেনেছি যে, যাগ-যজ্ঞ যত কিছুই করা হোক না কেন, শ্রীবিষ্ণুই হলেন সবকিছুর একমাত্র পরমার্থ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সব নিষ্ফল। আর তাঁর কৃপা পাবার একমাত্র উপায় সর্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রেমী মহাপুরুষদের চরণধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া। তাঁদের কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবানের নাগাল পাওয়া অসম্ভব।' এই শুনে ক্রোধান্ধ হিরণ্যকশিপু প্রিয়পুত্রকে প্রবল ঘৃণায় ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলেন। বললেন, 'যে তোর কাকাকে হত্যা করেছে, সেই দুষ্ট বিষ্ণুর ভৃত্য হয়েছিস তুই! ছি! ছি! এই পাঁচ বছর বয়সেই যদি পিতা-মাতা-আত্মীয়দের ভুলে আমাদের শত্রুপক্ষের তরফদারি করে, তবে তো ভবিষ্যতে ভয়ানক হানিকর কেউ হবে প্রহ্লাদ আমাদের কাছে। একে আর বিশ্বাস করা ঠিক নয়। যেমন, শরীরের কোন অঙ্গ পচে গেলে, সেই অঙ্গকে শরীর থেকে বাদ দিতে হয়, নাহলে সমগ্র শরীর নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি এই অবিশ্বাসী, অনিষ্টকারী ছেলেটাকেও শেষ করে ফেলতে হবে প্রাণে। আর একে বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না। আমার অনিষ্ট করার জন্যই আপনজন হয়ে এসেছে সংসারে। আহার-বিহার, নিদ্রা-বিশ্রাম যে কোন অবস্থায়, যে কোন উপায়ে বধ করে দাও একে।' আদেশ পালন করতে ভয়ঙ্কর দৈত্যরা ছুটে এসে ভয়ানক ক্রোধে সুতীক্ষ্ণ বল্লম দ্বারা খোঁচাতে লাগলো প্রহ্লাদকে। কিন্তু সে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার সাথে একাত্ম করে ধ্যানমগ্ন হয়ে নিশ্চিন্তে বসে রইল। শরণাগতবৎসল ভগবানের অপার করুণায় তার কোন ক্ষতি হল না। আতঙ্কিত হিরণ্যকশিপু নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন প্রহ্লাদকে বধ করার। তাঁকে মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় পিষে মারার চেষ্টা করা হল, মহাবিষধর সর্প দ্বারা দংশন করানো হল, অভিচার কর্তা পরোহিতদের দ্বারা রাক্ষসী উৎপন্ন করে হত্যার চেষ্টা করা হল, সুউচ্চ পর্বত থেকে তলদেশে ফেলে দেওয়া হল, অন্ধকার কুঠুরীতে অনাহারে রেখে, বিষ খাইয়ে, বরফঢাকা স্থানে বন্দী রেখে, অগ্নির ভয়ংকর লেলিহান শিখায় নিক্ষেপ করে, সমুদ্রে বারংবার চুবিয়ে, তুফানের ভিতর ছেড়ে দিয়ে, পর্বতের তলায় পুঁতে রেখে — ইত্যাদি নানাভাবে হত্যার চেষ্টা করা হল। কিন্তু কোনভাবেই সফল হলেন না হিরণ্যকশিপু। আশ্চর্য্য হলেন। শেষে আচার্যের পরামর্শমত পুণরায় প্রহ্লাদকে নৃপতির পালনীয় ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গুরুকুলে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের অন্তরের ভাব অবিচল রইল। একদিন দৈত্যবান্ধবদেরকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে শ্রীহরির চরণসেবা করে তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন। জানালেন ভগবানকে প্রাপ্ত হবার উপায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য — এই ষড়রিপুকে জয় করে সাধন ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেম লাভ করা যায় তা বললেন। সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাসকারী ভগবানকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিটি প্রাণীকে সম্মান করতে হবে। সকল জীবকে আপন জ্ঞান করে সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বাত্মা শ্রীভগবানকে ভক্তি করতে উপদেশ দিলেন। বললেন — ধর্ম, অর্থ, কাম সব শ্রীভগবানকে আশ্রয় করে আছে। তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কোন কিছু কখনোই প্রাপ্ত করা যায় না। কিন্তু সেসব লাভ করার জন্যে কামনা করলে পরিণামে সেই কামনা দুঃখেরই উদ্রেক করে। শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য এই নশ্বর প্রিয় শরীরও একসময় নষ্ট হয়ে আত্মা থেকে ছাড়া হয়ে যায়, তাই স্বামী, স্ত্রী, সন্তান,

যাগ-যজ্ঞ যত কিছুই করা হোক না কেন, শ্রীবিষ্ণুই হলেন সবকিছুর একমাত্র পরমার্থ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সব নিষ্ফল।

আত্মীয় পরিজনদের আর কি কথা! কামনাহীন হয়ে, কর্তৃত্বহীন হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি অর্জন করাতেই জীবনের একমাত্র পরমার্থ, একমাত্র সুখ। ভগবানকে কেবল ভক্তি আর প্রেমের দ্বারাই লাভ করা যায়। বাকী সব আচার পদ্ধতি বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁর প্রতি ভক্তির লক্ষণ হল সকল প্রাণীতে, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করা। প্রিয় বান্ধব প্রহ্লাদের এত হৃদয়স্পর্শী সদ্‌পরামর্শ দৈত্যবালকদের অন্তরে গেঁথে গেল। আচার্যের অহিতকর, বৈরীভাবের শিক্ষায় আর মন লাগলো না। আচার্য দেখলেন, আশ্রমের শিক্ষার্থীরা সকলে ভক্ত হয়ে গেছে, আসুরীভাব ভুলে প্রতিটি প্রাণীতে ঈশ্বরের বাস জেনে ভালোবাসছে। প্রমাদ গুনলেন তিনি। সত্বর হিরণ্যকশিপুর কাছে সব বৃত্তান্ত জানালেন। হিরণ্যকশিপু প্রচন্ড ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে, পদাহত সর্পের ন্যায় ফুঁসতে ফুঁসতে, পাপপূর্ণ কুটিল দৃষ্টিতে প্রহ্লাদের কাছে ছুটে গেলেন। স্থির করলেন, নিজহাতে বধ করবেন প্রহ্লাদকে। বললেন, 'ওরে বিধর্মী, তুই এত সাহস কোথা থেকে পাচ্ছিস? আমার বিরুদ্ধাচরণ করছিস যে, তোর প্রাণের ভয় নেই?' বালক প্রহ্লাদ বললেন,

'মহাপরাক্রমী, মহাকালস্বরূপ ভগবানের শরণাগত আমি। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন। আমি সেই ভগবানের আরাধনা করি। তাই আমার ভয় নেই। আপনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করুন। তাতেই আপনার মঙ্গল। যে নিজের ষড়রিপুকে জয় করতে পারে না, সে দশদিক জয় করেও ধ্বংস হয়ে যায়।' পুত্রের এমন ধৃষ্টতা দেখে হিরণ্যকশিপু একটি স্তম্ভ দেখিয়ে বললেন, 'তুই যে বলছিস তোর ভগবান সর্বত্র বিরাজ করে, তাহলে এই স্তম্ভের মধ্যে কোথায় তোর ভগবান? কোথায় সে? আছে কি? উত্তর দে।' নিষ্পাপ, নির্মলমনা, ভগবানের প্রতি পরমবিশ্বাসী, একনিষ্ঠভক্ত শিশু প্রহ্লাদ বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি এখানেও আছেন।' তৎক্ষণাৎ 'কোথায়, কোথায়, কোথায় তিনি?' — এই বলতে বলতে ক্রোধোন্মত্ত হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে প্রবল বলে মুষ্ঠাঘাত করতে লাগলেন। সে সময় নিজ ভক্তের বিশ্বাস আর আস্থাকে মর্যাদা দিতে, ভক্তের মুখবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করতে ভগবান আবির্ভূত হলেন। প্রহ্লাদের কথামতো প্রকট হলেন ভগবান সেই স্তম্ভ থেকে। ভয়ংকর সিংহনাদে আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত হল। অদ্ভুতরূপ ধারণ করলেন তিনি। মনুষ্যও নন, আবার প্রাণীও নন। কোমরের উপরের অর্ধাংশ সিংহের, আর নীচের অর্ধাংশ মনুষ্যের — নৃসিংহ রূপ তাঁর। করাল দন্ত পংক্তি, তরবারির মত শানিত লোলুপ জিহ্বা, তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় জ্বলজ্বলে ক্রোধান্ধ চক্ষু, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, ত্রাস সঞ্চারকারী মুখগহ্বর, বিস্ফারিত সকল গ্রাসকারী দৃষ্টি, মুখব্যাদানের বেগে মাথার কেশর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। প্রবল হুংকারে সবেগে ধেয়ে এলেন হিরণ্যকশিপুর দিকে। তখন দৈত্য সৈন্যরা নৃসিংহদেবকে আক্রমণ করতে ছুটে এলে, নিজের চক্র, গদা দ্বারা হত্যা করলেন তাদেরকে। গদা হাতে হিরণ্যকশিপু সম্মুখ সমরে নামলেন নৃসিংহদেবের সঙ্গে। কিন্তু গরুড় যেমন করে সর্প ধরে, তেমনি খেলাছলে যুদ্ধরঙ্গ করতে করতে একসময়ে অবলীলায় তাঁকে ধরে ফেললেন নৃসিংহদেব। ইন্দ্রের বিখ্যাত বজ্র যে মহাপরাক্রমশালী হিরণ্যকশিপুর দেহে আঁচড়ও কাটতে পারেনি, সেই মহাদৈত্য এবার নৃসিংহদেবের ভীষণ থাবা থেকে বাঁচতে সর্বচেষ্টা করতে লাগলেন মরিয়া হয়ে। প্রাণপণে ছাড়াতে চাইলেন নিজেকে। কিন্তু ভগবান যখন ধরেন, তখন তো আর ছাড়েন না — তা সে ভক্তকে ভালোবেসে ধরাই হোক বা পাপীকে আক্রোশে ধরাই হোক। হিরণ্যকশিপুর প্রার্থিত বর অনুযায়ীই সব ঘটল। ভগবান তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন রাজসভার দ্বারদেশে — অর্থাৎ ঘরেও না, বাইরেও না। তখন ছিল গোধূলি বেলা — অর্থাৎ দিনও না, রাতও না, নিজের জঙ্ঘার উপর হিরণ্যকশিপুকে শোয়ালেন এক ঝট্‌কায় — অর্থাৎ পৃথিবীতেও না, আবার আকাশেও না। এরপর তিনি — অর্থাৎ মানুষও নন, প্রাণীও নন, নৃসিংহরূপে নিজের তীক্ষ্ণ, করাল নখরাজি দ্বারা গরুড় যেমন করে মহাবিষধর সর্পকে ফালা ফালা করে তেমন করে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ ছিঁড়ে বিদীর্ণ করে দিলেন — অর্থাৎ কোন অস্ত্র বা শস্ত্রের দ্বারা হিরণ্যকশিপু বধ হল না। ছিটকে আসা রক্তে তাঁর মুখ, কেশর দেহ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। নৃসিংহদেব সেই রক্ত লোলুপাবস্থায় লেহন করতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপুর হৃৎপিন্ড উপড়ে নিয়ে মাটিতে বলের মতো ফেলে দিলেন। তাঁর নাড়ী, অন্ত্র বের করে নিয়ে গলদেশে মালার মতো পরে নিলেন। মৃতদেহের উপর ক্রমাগত আঘাত হানতে লাগলেন। বীভৎস, ভয়ানক সে দৃশ্য সহ্য করা যায় না, দেখা যায় না। সকলে স্তম্ভিত, ঘোর কাটতেই দৈত্য সেনারা ছুটে এল। কিন্তু নৃসিংহদেব সকলকে বধ করলেন। তাঁর গগনবিদারী সিংহনাদ আর হুংকারে ত্রিভুবন কম্পিত হলো। পদাঘাতে পৃথিবী যেন টলমল করে উঠল। তাঁর ভয়ানক ক্রোধে দিকসকল ভীত হয়ে পড়ল। অগ্নিবর্ষণকারী দৃষ্টিতে সূর্য, চন্দ্র ম্লান হয়ে গেল। তাঁর ক্রোধ-তপ্ত শ্বাসবায়ুর ধাক্কার ফলে সমুদ্র উত্তাল হল। মৃত হিরণ্যকশিপুর দেহ ছিন্নভিন্ন করেও নৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমিত হচ্ছিল না। ভয়ংকর ক্রোধে গর্জন করতে করতে রক্তাক্ত অবস্থায় সেই মৃতদেহ নিয়েই বিধ্বংসী খেলা খেলতে লাগলেন। কিন্তু ভগবানকে শান্ত না করা হলে এরপর যে প্রলয় আসবে। তাই ব্রহ্মাদিদেবগণ, মনুগণ, গন্ধর্বগণ, নাগগণ, রুদ্রগণ, পিতৃকুলগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, যক্ষগণ, কিম্পুরুষগণ, কিন্নরগণ, বৈতালিকগণ, ভগবানের পার্ষদগণ সকলে একে একে তাঁর স্তুতি করে ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি শান্ত হলেন না। সকলেই ব্যর্থ হলেন। এমনকী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও অসমর্থ হলেন নিজ পতিদেবের প্রচন্ডতা হ্রাস করে তাঁকে প্রসন্ন করতে। শেষে পিতামহ ব্রহ্মা বালক প্রহ্লাদকে বললেন প্রচেষ্টা করতে। ব্রহ্মার আদেশকে শিরোধার্য করে শিশু প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। নিজ পদপ্রান্তে অমন ক্ষুদ্র পাঁচ বৎসরের শিশুকে পড়ে থাকতে দেখে বিশালদেহী নৃসিংহদেবের মনে করুণার সঞ্চার হল। প্রহ্লাদকে সস্নেহে তুলে নিয়ে নিজের কোলে বসালেন তিনি। প্রহ্লাদের মস্তকে হস্ত বুলিয়ে শির আঘ্রাণ করলেন। শ্রীভগবানের করুণাময় হস্ত মস্তক স্পর্শ করতেই প্রহ্লাদ প্রেমপূর্ণ চিত্তে, ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে ভগবানের স্তুতি করলেন, ভক্তবিপদহারী ভগবানের পরম অদ্ভুত গুণাবলী স্মরণ করতে করতে বললেন, 'প্রভু, আপনার এই উগ্র নৃসিংহরূপ, তীক্ষ্ণ করাল দন্তরাজি, তেজোদীপ্ত দৃষ্টি, লোলজিহ্বা, ভয়ংকর মুখ, গলদেশে রক্তাক্ত অন্ত্রসমূহের মালা, রুধিরলিপ্ত রক্তবর্ণ কেশর, প্রখর নখররাজি, শঙ্কুর মতো কর্ণ, ভয়

উদ্রেককারী সিংহনাদ — এসব কোন কিছু দর্শন করে আমি ভীত নই। আমি ভীত কেবল এ সংসারের তীব্র শোষণে। যন্ত্রস্থ ইক্ষুর ন্যায় আমরা এ সংসারে নিত্য পেষিত হচ্ছি। এসব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় আপনার শ্রীচরণলাভ। ধন, রূপ, বিদ্যা, কৌলিণ্য, তেজ, পৌরুষ, এসব কোন কিছু দ্বারা তো আপনাকে প্রসন্ন করা যায় না। আপনি কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিতে তুষ্ট হন। মুখশ্রী যেমন দর্পনের দৃশ্যমান প্রতিবিম্বকে সুন্দর করে তেমনি ভক্ত ভগবানকে যে সম্মান দেন তা নিজে ফেরত পান। আপনার সেবার ছয় প্রকার পদ্ধতি — নমস্কার, স্তুতি, সেবা-পূজা, চরণকমলের সেবা চিন্তন বা স্মরণ, আপনার নাম-গান শ্রবণ এবং সমস্ত কর্ম সমেত নিজেকে আপনার চরণে নিবেদন। এছাড়া আর কী উপায়ে আপনাকে পাওয়া যেতে পারে, বলুন প্রভু কৃপা করে।'

শ্রীনৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমিত হল বালকের মুখে এত ভক্তি ভরা কথা শ্রবণ করে। তিনি বর প্রার্থনা করতে বললেন প্রহ্লাদকে। বর ভিক্ষা করা যে, ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তির পথে বাধা স্বরূপ তা প্রহ্লাদ জানতেন। বিশুদ্ধ ভক্তের তো ভগবানের কাছে কোন চাহিদা বা কামনা থাকে না। তাই বললেন, 'ভগবানের দ্বারা যে সেবক নিজের কামনা চরিতার্থ করতে চায়, সে তো সেবক নয়, সে বণিক। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত। তথাপি, আপনার আদেশকে শিরোধার্য করে এই প্রার্থনা করলাম যে, যদি আমায় বর দিতেই হয় তবে এই বর দিন যে, কোনদিন কোন কামনার বীজ আমার হৃদয়ে যেন অঙ্কুরিত না হয়। কারণ, মানুষের যখন কামনা দূরীভূত হয় তখনই সে ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ভগবানের শ্রীচরণ লাভ করে।' নিদারুণ প্রসন্ন হয়ে নৃসিংহদেব বললেন, 'তথাস্তু! তবে আমার প্রীতির জন্য তুমি এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত দৈত্যাধিপতিদের বিষয় ভোগ কর এখানে থেকে। পরে আমার পরমধামে ফিরে এসো।' প্রহ্লাদ প্রণাম নিবেদন করে বললেন, 'ভগবান, ভয় থেকে মুক্ত হবার জন্য ভক্তরা যুগে যুগে আপনার এই নৃসিংহ রূপ স্মরণ করবে। যে একাগ্রচিত্তে আপনার এই মূর্তির ধ্যান করবে সে, সব রকম ভয় থেকে, এমনকী মৃত্যুভয় থেকেও মুক্ত হবে। আপনাকে আমার অনন্ত অর্বুদ কোটি প্রণাম।'

।। জয় নৃসিংহদেব।। জয় প্রহ্লাদ মহারাজ।।

রাধাবিনোদিনী দাসী (শ্রীমতি বিন্তি বণিক) বিগত ২০ বৎসর ধরে ভক্তি জীবনে যুক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র পার্ষদবৃন্দের জীবনী লেখনীর সুমহান কার্য্যে ব্রতী আছেন।

অঙ্কন ঃ কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক

ছানার লুচি বা পরোটা

ছাঁকা তেলে ভাজলে লুচি আর, তাওয়াতে ভাজলে পরোটা

উপকরণ ঃ

ময়দা ১ কিলোগ্রাম। ছানা ৫০০ গ্রাম। জিরাগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ। লংকাগুঁড়ো ১ চা চামচ। আদার রস ১ টেবিল চামচ। ধনেপাতা ৫০ গ্রাম। লবণ ২ চা চামচ। চিনি গুঁড়ো ১ চা চামচ। গরম মশলা ১ চিমটি। তেল বা ঘি ১৫০ গ্রাম। ছাঁকা তেলে ভাজতে হলে অধিক ৫০০ গ্রাম তেল বা ঘি লাগবে।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

প্রথমে ময়দা, ১ চা চামচ লবণ, তেল বা ঘি, পরিমাণ মতো জল দিয়ে মাখিয়ে একটি তাল তৈরি করে রাখুন। ঐ তালটি একটু নরম হবে।

ছানার জল ঝরিয়ে নিন। ধনেপাতা বেটে নিন। জিরাগুঁড়ো, লংকাগুঁড়ো, গরম মশলা, চিনিগুঁড়ো, আদার রস, বাকী লবণ একসাথে ভালো করে একটু শক্ত করে মাখতে হবে।

এবার ময়দার তাল থেকে ৪০টি লেচি কাটুন এবং মাখানো ছানা থেকে ৪০টি লেচি কাটুন। ময়দার একটি লেচি নিয়ে ছোট্ট বাটির মতো তৈরী করুন। আর ছানার একটি লেচি নিয়ে তার মধ্যে ভরে দিয়ে মুখটা সাবধানে বন্ধ করে দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিন। এইভাবে সবগুলো লেচিতে পুর ভরে চ্যাপ্টা করে দিন।

এবার যদি ছাঁকা তেলে অর্থাৎ লুচি বানাতে চান, তা হলে কড়াইতে ৫০০ গ্রাম তেল বা ঘি গরম করুন।

পুরভরা লেচিগুলো আস্তে আস্তে বেলে নিন, যাতে ফেটে না যায়। একটা একটা করে কড়াইতে দিন। অর্ধেক ফুলে উঠলে উল্টিয়ে দিন। নইলে ফেটে যাবে। বাদামী রং হলে ছানতায় করে নামিয়ে নিন।

আর, যদি তাওয়াতে পরোটা বানাতে চান, তা হলে একই ভাবে পুরভরা লেচিগুলো সাবধানে বেলে নিন। একটি করে প্রথমে শুকনো তাওয়াতে দিন। অর্ধেক ভাজা হলে তারপর একটু তেল বা ঘি দিন। পরোটার চারদিক একইভাবে ভাজুন। বাদামী রং হলে খুনতিতে নামিয়ে নিন। এইভাবে সব পরোটা ভাজুন।

ছোলার ডাল, অথবা টক দই, কিংবা আচারের সাথে এই লুচি বা পরোটা শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

— বলিরাজ দাস

জপ করুন, আনন্দিতে থাকুন　জপ করুন, আনন্দিতে থাকুন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

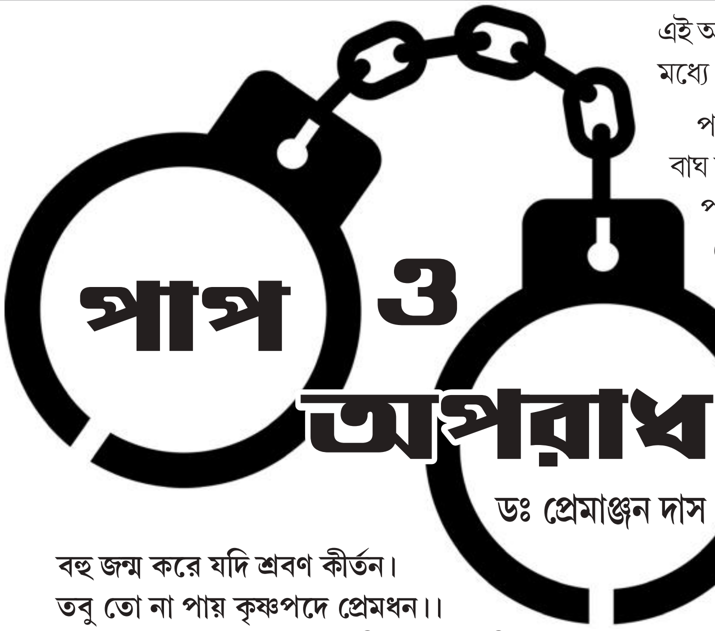

পাপ ও অপরাধ

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন।
তবু তো না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।

(চৈতন্য চরিতামৃত, আদি,
৮ম অধ্যায়, শ্লোক - ১৬)

এক হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।।

(বৈষ্ণব শ্লোকাবলী,
২য় অধ্যায়/জপ কীর্তন)

আপাত দৃষ্টিতে উপরের শ্লোক দুটিকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা পরস্পর বিরোধী নয়।

শাস্ত্রে এরকম বহু শ্লোক আছে যেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। কোনও কোনও শ্লোক পড়ে মনে হয় যে, ভগবানের কৃপা লাভ করা অতি সহজ। আবার কোনও কোনও শ্লোক পড়ে মনে হয় আমার মতো পতিত জীবের পক্ষে ভগবানের কৃপা লাভ করা অসম্ভব। কোথাও বলা হচ্ছে —

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তুভং হেলনামেব বা।
বৈকুন্ঠ নাম গ্রহণ অশেষাঘ হরং বিধু।।

অর্থাৎ কেউ যদি সাংকেতিকভাবে, পরিহাস করে, অবহেলা করেও ভগবানের নাম গ্রহণ করে, তাতেও অশেষ পাপ নষ্ট হয়।

আবার বলা হচ্ছে —

অপরাধ নাহি ছাড়ি নাম যদি লয়।
সহস্র সাধনে তার ভক্তি নাহি হয়।।

(শ্রী হরিনাম চিন্তামণি,
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

এই আপাত বিরোধের সমাধান বুঝতে হলে পাপ ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে।

পশুদের কোনও পাপও নেই, অপরাধও নেই। একটি বাঘ যখন কোনও মানুষকে হত্যা করে, তখন বাঘের কোনও পাপ বা অপরাধ হয় না। এর কারণ কী? কারণ পশুর চেতনা অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। একই কারণে মানব শিশুরাও আট বছর বয়স পর্যন্ত পাপ করতে পারে না। কারণ তখন তাদের জ্ঞান বিকশিত হয় না। পশুরা তাদের পূর্ব জন্মের পাপ ভোগ করে। একটি শেয়াল বহু কষ্টে জীবন যাপন করে তার পূর্ব মনুষ্য জন্ম কৃত পাপের ফল ভোগ করার জন্য। কিন্তু শেয়াল জন্মে সে কোনও নতুন পাপ বা নতুন পুণ্য সঞ্চয় করতে পারে না। সেজন্য পশু জন্মকে বলা হয় ভোগক্ষেত্র। আর মনুষ্য জন্মকে বলা হয় কর্মক্ষেত্র।

এ ব্যাপারে একটি শিক্ষামূলক গল্প আছে। একটি সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না। করিলে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হইবে'। একদিন একটি মূর্খ লোক এবং অন্য একজন শিক্ষিত লোক সেই সাইনবোর্ডের নিচে প্রস্রাব করে। পুলিশ দুজনকেই আদালতে নিয়ে যায়। বিচারপতি যখন জানতে পারলেন যে, মূর্খ লোকটি সাইনবোর্ডের লেখা বুঝতে পারেনি, তখন তিনি তার জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা ধার্য করেন। কিন্তু পন্ডিত লোকটির জন্য পাঁচশত টাকাই জরিমানা ধার্য হয়েছিল। কেননা তিনি সাইনবোর্ডটি পড়ে, সজ্ঞানে সেখানে প্রস্রাব করেছিলেন।

সজ্ঞানে যে পাপ, তাকে বলে অপরাধ। জ্ঞানপাপীরাই অপরাধী। শ্রীল প্রভুপাদ একবার বলেছিলেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার হওয়ার আগে পাশ্চাত্য দেশবাসীদের অনেকেই জানতেন না যে, পশুহত্যা পাপ। তখন তারা যে পশুহত্যা করত, তাতে তাদের কোনও অপরাধ হত না। জ্ঞানের বিকাশের মাত্রা অনুসারে পাপ ও অপরাধের মাত্রা বাড়তে থাকে। মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে অজ্ঞানী, যারা প্রায় পশুর সমান, তাদেরকে বলা হয় অন্ত্যজ। অন্ত্যজরা শূদ্রদের থেকেও অধিকতর অজ্ঞানী। তাই তাদের জীবনে

পাপ ও অপরাধ নেই বললেই চলে। অন্ত্যজদের একটু উপরে রয়েছে শূদ্ররা। শোকাৎ দ্রবতি ইতি শূদ্র — যারা অল্প দুঃখেই চোখের জল ফেলে বা সহজেই চোখের জল ফেলে, তাদেরকে বলা হয় শূদ্র। অন্ত্যজদের তুলনায় শূদ্ররা আরও একটু উন্নত। তাই তাদেরও কিঞ্চিৎ পাপ হয়। শূদ্রদের থেকে উন্নত হচ্ছে বৈশ্য। তাদের জ্ঞান আরও উন্নত। তাই বৈশ্যরা যদি পাপ করে, তাদের পাপ শূদ্রদের থেকে বেশী গুরুতর হয়। একই রকম ভাবে বৈশ্য থেকে ক্ষত্রিয় উন্নততর এবং ক্ষত্রিয়ের

সুতরাং গাদায় গাদায় নাম গ্রহণ করার থেকে একবার শুদ্ধ নাম গ্রহণ করলে অনেক ফল লাভ হয়। তাই নামের গুণগত দিকে নজর বেশী দিতে হবে।

উপরে ব্রাহ্মণ এবং সর্বোপরি বৈষ্ণবের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত। জ্ঞান যত পরিপক্ক, দায়িত্ব তত বেশী। দায়িত্ব যত বেশী, পাপ করলে তার ফলও বেশী ভোগ করতে হয়। এটা শুধু শাস্ত্রের নিয়মই নয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত আদালত এই একই নিয়ম কমবেশী মানে। তাই কোনও নাবালক যদি খুন করে, তার ফাঁসী হবে না। কিংবা বদ্ধ পাগল অন্যায় করলে তার তেমন শাস্তি হয় না। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক জ্ঞান পাপীদের বড় রকমের শাস্তি — এমন কি ফাঁসীর মতো শাস্তিও ভোগ করতে হয়।

সুতরাং জ্ঞান যেমন একদিকে মস্ত বড় আশীর্বাদ, অন্যদিকে তা মস্ত বড় ঝুঁকিও বটে। আর সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা নিতে

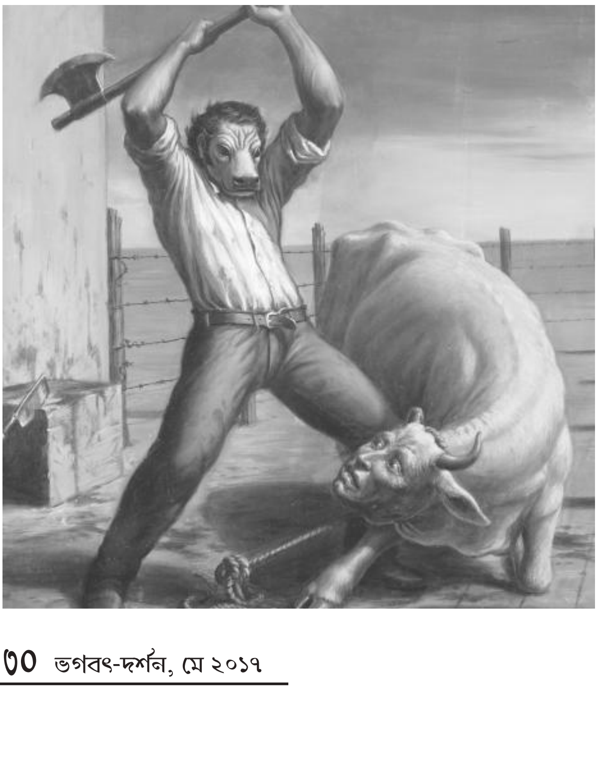

হয় ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের। তারা অন্যায় করলে অপরাধ হয়ে যায়। ফলে ভগবান তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্পদ কৃষ্ণপ্রেম দান করেন না। হরিনাম করে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া একটি ছোটখাট পুরস্কার মাত্র। পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার পরও মানুষ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ সে অপরাধ বন্ধ না করবে।

বৈষ্ণবদের জন্য শাস্ত্রে দশটি নাম অপরাধ, দশটি ধাম অপরাধ এবং দশটি সেবা অপরাধের উল্লেখ আছে। দু-একবার আকস্মিক ভুল ভ্রান্তি হলে ভগবান অবশ্যই ক্ষমা করেন। কিন্তু বার বার অপরাধ করলে, হরিনাম করেও — সহস্র সাধনে তার ভক্তি নাহি হয়।

সুতরাং গাদায় গাদায় নাম গ্রহণ করার থেকে একবার শুদ্ধ নাম গ্রহণ করলে অনেক ফল লাভ হয়। তাই নামের গুণগত দিকে নজর বেশী দিতে হবে। যারা মনে করে, হরিনাম যত পরিমাণ পাপ হরণ করতে পারে, কোটি জন্মে মহাপাপী ব্যক্তিও তত পাপ করতে পারে না, সুতরাং পাপে আমার ভয় কিসের, তাদের উদ্দেশ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন —

সেই ত' ভরসা করি প্রবঞ্চক জন।
শঠতা করিয়া নাম করয়ে গ্রহণ।।

নাম গ্রহণকারী ব্যক্তির পাপ করা দূরে থাকুক — পাপে মতি হলেই নাম অপরাধ হয় এবং এই অপরাধের শাস্তি প্রচন্ড। যিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেননি, তার পক্ষে পাপ করলে সহজ প্রায়শ্চিত্ত আছে।

কিন্তু নাম বলে যদি পাপে করে মতি।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বড়ই দুর্গতি।।
বহু যম যাতনাদি পাইলেও তার।
সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার।।
পাপে মতি মাত্রে হয় এরূপ যাতনা।
পাপাচারে যত দোষ তার কি গণনা।।

(শ্রী হরিনাম চিন্তামণি, নবম পরিচ্ছেদ)

এজন্যই ইসকনে প্রথমে মানুষকে চারটি নিয়ম প্রদান করা হয়। যারা এক বছর ধরে চারটি নিয়ম পালন করতে সক্ষম হবে তাদেরকে নাম দীক্ষা প্রদান করা হয়। অবশ্য দীক্ষা ছাড়াও মানুষ হরিনাম করতে পারবে। তাতে সে পাপ থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু যতদিন ভক্ত অপরাধ শূন্য না হবে, কৃষ্ণ প্রেমের অমল আনন্দ তাঁর কাছে অধরাই থেকে যাবে। সে যে কত বড় শাস্তি, অধিকাংশ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না।

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস দীর্ঘ ৩১ বৎসর যাবৎ ইসকনের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত আছেন। তিনি বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পি. এইচ. ডি. করেছেন। প্রথম দিকে তিনি বিবিটি'র সেবায় যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মায়াপুর ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

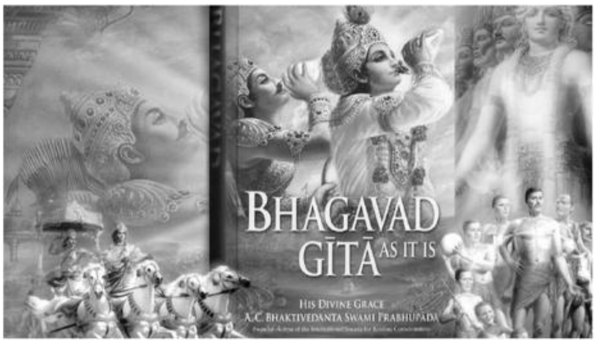

আমেরিকান উচ্চ রাজনৈতিক নেতাদেরকে ভগবদ্গীতা বিতরণ

২০১৬ সাল রাজনীতিতে ভারতীয় আমেরিকানদের কাছে এক মহত্ত্বপুর্ণ সাল। পাঁচ ভারতীয় আমেরিকান, এক ভারীমাত্রায় আমেরিকান কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই অসামান্য সাফল্যকে উদ্‌যাপন করার জন্য কংগ্রেস সদস্যরা, বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, সমর্থকরা এবং ইসকন ৩রা জানুয়ারী ওয়াশিংটন ডিসির ইন্দাস পোরাতে একত্রিত হয়েছিল।

এই দ্বিপাক্ষিক অনুষ্ঠান ভারতীয় আমেরিকানদের সেই দেশের রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছিল। এটি নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়েছিল এবং নতুন সদস্য ও বর্তমান সদস্যদের সম্পর্ক স্থাপন ও শক্তি বৃদ্ধিতে অনুমোদনও করেছিল।

ইন্দাস পোরা অনুষ্ঠানে ইসকনের উপস্থিতি ভগবদ্গীতার মূল্যবোধ এবং মূলনীতি একটি স্মারক ছিল যা ভারতীয় আমেরিকান সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ এবং পরবর্তীকালে যা আমেরিকান সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নেতাদের তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেই সন্ধ্যায় ভগবদ্গীতা উপহার গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে ছিলেন সংখ্যালঘু নেতা ন্যান্সি কোলাসি, U.S. সার্জন জেনারেল ডঃ বিবেক মুর্তী এবং আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত মহামান্য নভতেজ সরনা।

ইসকন গোবর্ধন পরিবেশ গ্রাম ভ্রমণে রাষ্ট্র সংঘের সম্মানীয় WTO পুরস্কার জয় করেছে

নতুন দিল্লী ২১শে জানুয়ারী, ২০১৭ ঃ ইসকন গোবর্ধন পরিবেশ গ্রাম (GEV) ভারতের পক্ষে মাদ্রিদে ১৮ই জানুয়ারী রাষ্ট্রসংঘের সম্মানীয় বিশ্ব ভ্রমণ সংস্থা (UNWTO) পুরস্কার লাভ করেছে। এই জয় ইনোভেশন ইন নন গভর্ণমেন্টাল অরগানাইজেশন বিভাগে পঞ্চান্নটি দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

UNWTO পুরস্কারটি বিশ্বের ভ্রমণ ক্ষেত্রে অন্যতম লোভনীয় পুরস্কার। এই পুরস্কারের তেরতম বর্ষে পঞ্চান্নটি দেশ থেকে পুরস্কারের জন্য ১৩৯টি আবেদন পত্র এসেছিল। গোবর্ধন পরিবেশ গ্রাম মুম্বাই-এর কাছে ওয়াদাতে প্রায় সত্তর একর জমি নিয়ে তৈরী হয়েছে। এটি প্রথম ভারতীয় বছর যা UNWTO পুরস্কার জিতেছে। ভারতবর্ষের এক প্রত্যন্ত উপজাতীয় অঞ্চলে দারিদ্র দূরীকরণ এবং জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত রসদ যোগাতে ইকোট্যুরিজমের ব্যবহার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সম্মানিত হয়েছিল।

স্নায়ুবিদদের গবেষণা বলছে মহামন্ত্র উদ্বেগ এবং স্কিজোফ্রেনিয়া কমাতে সাহায্য করে

ডঃ বিবেক বালুজা, ডেট্রয়েটের হেনরিফোর্ড হাসপাতালের একজন স্নায়ুবিদ। মস্তিস্কের ওপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রভাব

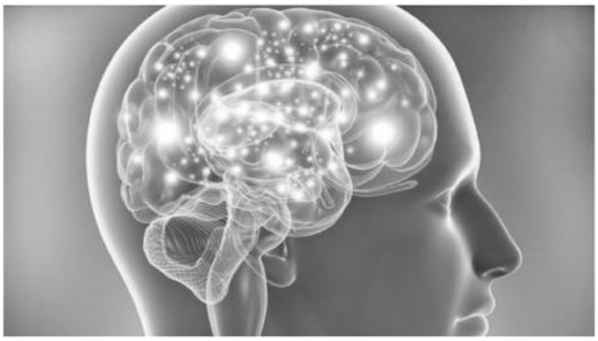

নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন যা থেকে ইতিমধ্যেই উৎসাহ ব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে যা হাসপাতালের কর্মীদের প্রভাবিত করেছে।

প্রথমে একজনের মস্তিস্কের তরঙ্গ পরিলক্ষ্যিত করা হয়েছে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায়। পরে আবার মস্তিষ্ক তরঙ্গের পরিমাপ নেওয়া হয়েছে চারবার পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র এবং আধঘন্টা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের পর। তারপর পার্থক্যটির হিসাব রাখা হয়েছে।

ফল অবিশ্বাস্য। পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে তথাকথিত বিশ্রামরত অবস্থায় মস্তিস্ক প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম নেয় না। ডঃ বিবেক বলছেন, আপনার মস্তিস্ক অনবরত আপনাকে তথ্য জুগিয়ে যাচ্ছে। জপের পর পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে মস্তিষ্ক প্রায় কোন কাজ করছে না। এটি খুবই আশ্চর্যজনক, কারণ এটি দেখাচ্ছে যে আপনি সত্যিকারের মস্তিষ্ককে শান্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

ডঃ বিবেকের মতে, যা সর্বোচ্চ বিস্ময়, কারণ বর্তমানে ডাক্তারেরা এই রকম মস্তিষ্ক শান্ত করতে একমাত্র মৃগী নিরোধক ঔষধ ব্যবহার করছে। এই পদ্ধতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, স্কিজোফ্রোনিয়া এবং অন্যান্য মানসিক রোগাক্রান্ত রোগীদের রোগ নিবারণে সহায়তা করে।

ইসকনের পঞ্চাশ বৎসর পুর্তি উপলক্ষে পেরুভিয়ান পার্লামেন্টে প্রভুপাদ বন্দনা

ভদ্ররূপ দাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ আঙ্গুর রস প্রসাদম দিয়ে টৌষ্ট বানিয়েছিলেন।

১২ই ডিসেম্বর, পেরুভিয়ান ভক্ত ভদ্ররূপ দাসকে পেরুভিয়ান পার্লামেন্ট লিমাতে শিক্ষার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দান করে। কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে তিনি ঘটনাটির মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং এক বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদ, ইসকন এবং ইসকনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির বন্দনা করেন।

সম্মানীয় পার্লামেন্টের কাছে এটি একটি বিরল সুযোগ ছিল, কারণ সাধারণত সাম্মানিক উপাধিগুলি বিশ্ববিদ্যালয়েই দেওয়া হয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে ইসকনের ৫০ বৎসর পূর্তির অনুষ্ঠানটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যা কিনা পেরুর জাতীয় দুরদর্শন কেন্দ্র চ্যানেল সেভেন সারা পেরু দেশে প্রচার করে।

ভদ্ররূপ দাস একজন বংশীবাদক ইসকন এবং পাশ্চাত্য ঘরানার এবং তিনি একজন আবিষ্কারকও যিনি এই দুই ঘরানার তাল মেল করেন তার নিজস্ব বংশীতে। তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করা হয়েছিল তাঁর বিশ্বের প্রতি শিক্ষক, সুরকার, গবেষক, বংশীবাদক এবং বিশ্বপ্রেমে অবদানের জন্য।

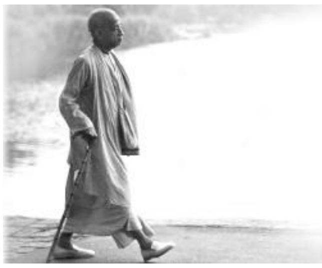

শ্রীল প্রভুপাদের চলচ্চিত্র এই গ্রীষ্মে সিনেমা হলগুলিতে মুক্তি পাবে

ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের জীবনীর ওপর নব্বই মিনিটের একটি সমৃদ্ধ তথ্যচিত্র এই গ্রীষ্মের জুন মাসে প্রকাশিত হতে চলেছে যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হবে। এটি আমেরিকার ২০টি মুখ্য শহরের আর্ট থিয়েটারে দেখানো হবে যার শুরু হবে নিউইর্য়ক সিটি থেকে।

তথ্যচিত্রটির মূল নামকরণ ছিল 'আচার্য'। ফ্লোরিডার জেন সিভিলের জনগণের কাছে সফল পরীক্ষা প্রদর্শনের পর এর পুনঃ নামকরণ হয় 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আন্দোলন এবং স্বামী যিনি সর্বতোভাবে এটি শুরু করেছিলেন'।

আমেরিকান হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইব্রেরী'র শ্রীমদ্ভাগতম সেট ক্রয়

দীপাবলী উৎসব উদযাপনের দিন ৩১শে অক্টোবর ওয়াশিংটন ডিসি আমেরিকার হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইব্রেরী সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের লেখা শ্রীমদ্ভাগতম এর একটি সম্পূর্ণ সিরিজ ক্রয় করে।

এর মধ্যে ১৪ই ডিসেম্বর ভারতীয় দূতাবাস তাদের লাইব্রেরীতে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ আটটি গ্রন্থ সংগ্রহ করে।